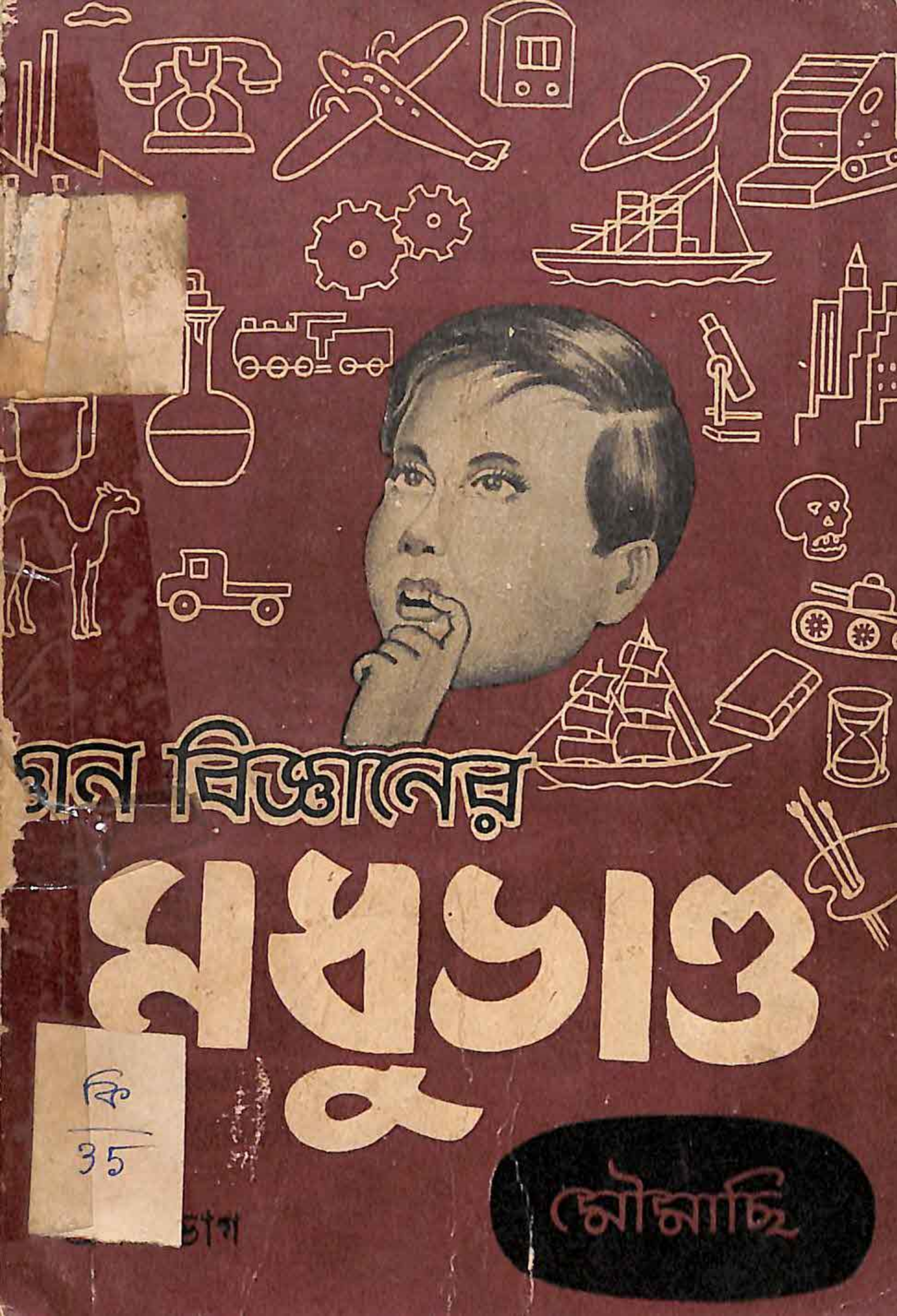


ান বিজ্ঞানের
মধুভাণ্ড
ভাগ
মৌমাছি

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

প্রথম ভাগ

মৌমাছি

যাদবপুর কলেজ অব্ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেক্‌নোলজির সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর হীরালাল রায়, এম-আই-কেম্-ই, এ-বি (হার্ভার্ড), ডক্টর, ইং (বার্লিন) লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

অষ্টম সংস্করণ

এক টাকা দশ আনা

২৫, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, এবং
মিত্রালয় ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
জি, ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

যাঁর উপদেশ ও সুপরামর্শের সাহায্যে
'আনন্দ-মেলা'র পরিচালনায় সকলের প্রীতির পাত্র হয়েছি
আনন্দবাজার পত্রিকার সেই সুযোগ্য প্রধান সম্পাদক
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের
করকমলে
অমার অকপট শ্রদ্ধার অঞ্জলি
'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড' দিলাম।

—'মৌমাছি'

১৫।৭।৪১

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

প্রথম ভাগ

১ম সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ১৯৪১

২য় সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৪১

৩য় সংস্করণ—নভেম্বর ১৯৪২

৪র্থ সংস্করণ—মে ১৯৪৩

৫ম সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৪৪

৬ষ্ঠ সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫

৭ম সংস্করণ—ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬

৮ম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৪৯

দ্বিতীয় ভাগ

১ম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৪১

২য় সংস্করণ—জুন ১৯৪২

৩য় সংস্করণ—এপ্রিল ১৯৪৩

৪র্থ সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৪৪

৫ম সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৪৫

৬ষ্ঠ সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৪৬

তৃতীয় ভাগ

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৪৩

দ্বিতীয় সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৪৬

ভূমিকা

অনুসন্ধিৎসা জীবন্ত মানব-মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। মন যতদিন সজাগ থাকবে জ্ঞান লাভের পিপাসা ততদিন নিবৃত্ত হবে না। এই ভাবের অভাব হলেই বুঝতে হবে যে মানসিক জড়তা এসেছে। শিশু কথা বলতে শিখলেই তার মন নূতন জগতের পরিচয় লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং প্রশ্নে প্রশ্নে তার আশপাশের সকল লোককে অস্থির করে তোলে। অনেকে বিরক্ত হয়ে তাকে ভর্ৎসনা দিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন—কতকটা নিজেদের অজ্ঞতা গোপন করার জন্য। কিন্তু এইভাবে শিশুর জিজ্ঞাসু মনকে দমিয়ে দিলে তার মানসিক উন্নতির বিঘ্ন ঘটানো হয়। এটা কোন প্রকারে বাঞ্ছনীয় নয়। যথা সম্ভব জ্ঞানলাভে তাকে উৎসাহিত করাই উচিত। কিন্তু এর আর একটা দিকও আছে। অনায়াসলব্ধ জ্ঞান বা বস্তুর প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকে না; প্রশ্ন করা মাত্রই উত্তর দিলে শিশুর জ্ঞান বাড়তে পারে কিন্তু তার চিন্তাশক্তির বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না, চিন্তা-শক্তির বিকাশ জ্ঞানলাভের চেয়েও অধিকতর প্রয়োজনীয়। মনের অলসতা দূর করার জন্য শিশুকে পরিশ্রম করতে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে বাধ্য করা দরকার। প্রশ্নের উত্তর তার নিজের চিন্তাশক্তি দিয়ে সমাধান করাতে পারলেই ভাল; যদি তা সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ যেখানে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে সেই ভাণ্ডার তাকে দেখিয়ে দিতে হয়। জগতের সব দেশের ছোটদের জন্যেই এই রকম

'জ্ঞান-ভাণ্ডার' লেখা হয়েছে সহজ এবং সরল করে। আমাদের বাংলা ভাষায় এই রকম বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। যে দু'চারখানি আছে, তাতে প্রশ্ন সংখ্যার শেষ নেই, কিন্তু জবাবগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। স্নেহাস্পদ 'মৌমাছি' আনন্দবাজার পত্রিকার 'আনন্দমেলা' বিভাগে সাধারণ জ্ঞানের জবাব দিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, কাজেই তাঁর সঙ্কলিত "জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" বইটি পড়ার পর একথা আমি বলতে পারি যে এই বই সে অভাব অনেক পরিমাণে দূর করবে। শিশু-সাহিত্যের নতুন নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বইগুলির বিষয়নির্ব্বাচন, লিখনপ্রণালী ও রচনাপদ্ধতি প্রশংসনীয় নয়। এ বইটি সেদিক থেকে আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছে, কারণ বিজ্ঞানের জটিল তথ্যকে সহজ করে বোঝানোর ক্ষমতা লেখকের প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটে উঠেছে—বিষয় নির্ব্বাচন ও পরিকল্পনার দিক থেকেও "জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" সাধারণ জ্ঞানের একখানি অভিনব বই বলে গণ্য হবে। বইটিতে জ্ঞাতব্য বিষয় যথেষ্ট আছে এবং চিন্তাশক্তিকে তীক্ষ্ণ করার উপযোগী সরঞ্জামও বিদ্যমান। আশা করি এই বইটি এদেশের ছেলেমেয়ে, তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকসমাজ সকলের কাছেই আদর পাবে। স্নেহাস্পদ 'মৌমাছির' পরিশ্রম সার্থক হবে।

কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেক্নোলজি
যাদবপুর ১৩।৯।৪১

শ্রীহীরালাল রায়

এই বইটির গোড়ার কথা

প্রায় দেড় বছর আগে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'র কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের পত্রিকায় এ দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও কল্যাণের জন্য 'আনন্দ-মেলা' নাম দিয়ে সপ্তাহের একটি দিনে একটি পাতায় আনন্দের পরিবেষণ করবেন ঠিক করেন এবং আমি 'মৌমাছি' ছদ্মনামের অন্তরালে সেই 'আনন্দ মেলা'র পরিচালনাভার গ্রহণ করি। তখনই আমার মনে হয় যে, গল্প ছড়া ছবি পরিবেষণের সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি-পত্রের মারফৎ শিশু ও কিশোর মনের প্রশ্নগুলি জানা একান্ত দরকার এবং সাধ্যমত খেটে তাদের সেই কৌতূহলের সন্তোষজনক জবাব, সোজা ভাষায় বুঝিয়ে দিলে, হয়তো দেশের ছেলেমেয়েদের মনে জ্ঞানলিপ্সা বাড়তে পারে।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের বড়রা শিক্ষিত হলেও প্রশ্ন আর সমস্যাকে এড়িয়ে চলেন, কারণ ছোটবেলা থেকে তাঁদের মনের কৌতূহল বৃত্তিটিকে কোন দিনই বাড়তে দেওয়া হয়নি!—এর বাস্তব অভিজ্ঞতা আমি আমার নিজের জীবন থেকেই বলতে পারি—কারণ যখন ছোট ছিলাম, তখন যদি বড়দের কাউকে কোনও প্রশ্ন করতাম তাহলে বকুনি খেতাম। স্কুলে মাস্টার মশাইরা রোজকার পড়া তোতাপাখীর মতো পড়িয়ে যেতেন বটে, কিন্তু পড়ার বইয়ের বাইরে কোনও প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করতাম তখনই মাস্টার মশাইরা বল্‌তেন—"ডেঁপো, ফাজিল, ও দিয়ে তোমার কি হবে শুনি?"—একথা বর্ত্তমানের মাস্টার মশাইরাও যে অনেকেই বলেন, সে খবরও পেয়েছি এই দুটি বছর দেশের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে হাজার হাজার চিঠি পেয়ে। তাই আমি 'আনন্দ-মেলার' চিঠির থলিতে আমার ছোট্ট বন্ধুদের মনের নানা রকম প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে শুরু করি এবং তাদের সেই সমস্ত প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে নিজেও অনেক কিছু শিখ্‌ছি ও শিখেছি—এবং আরও ভাল করে বুঝেছি যে কৌতূহলী মনের প্রশ্নের জবাবগুলি জান্‌তে পারলে—অনায়াসে কি করে জ্ঞান-লিপ্সা বেড়ে চলে। তাই মনে হয়েছে

বিশ্বমানবের এই কৌতূহলী মনকে খুশি করতে পারাটাই পৃথিবীর সবচেয়ে মহত্তর কাজ; তাই, 'আনন্দ-মেলা'র বন্ধুদের কৌতূহলী প্রশ্নভরা চিঠিগুলি হয়ে উঠল আমার কাছে একটা মস্ত সম্পদ। আমি সেই চিঠিগুলির লেখকদের বয়সের সঙ্গে তাদের প্রশ্নের সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের একটা তুলনামূলক তালিকাও প্রস্তুত করলাম। কারণ শিশু-মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এর একটা বিশেষ দাম আছে। আমাদের দেশে অসংখ্য সাধারণ-জ্ঞানের বই থাকা সত্ত্বেও বহু শিক্ষক ও অধ্যাপক আমার এই জবাবগুলিকে একত্র করে বইয়ের আকারে প্রকাশ করতে অনুরোধ জানালেন, কারণ তাঁদের মতে সে বইগুলিতে মনস্তত্ত্বের বিচারে ছোটদের মনের মাপ অনুযায়ী প্রশ্ন ও প্রশ্নের জবাব নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সেই সব বইয়ের লেখকরা অসাধারণ পরিশ্রম করে রাশি রাশি প্রশ্নের সংখ্যা বাড়িয়ে একটি বইয়ে কে কত বেশী প্রশ্নের জবাব কত কম দামে দিতে পারেন – সেই চেষ্টাই করেছেন; অথচ ছোটদের আনন্দ দিয়ে আগ্রহ জাগাতে পারে এমন কোনও ব্যবস্থার দিকে তাঁরা নাকি তেমন কোনও দৃষ্টি দেন নি। এর জন্য আমি তাঁদের কোনও দোষ দিই না, কারণ এ দেশের শিশু-সাহিত্য-লেখকদের মনের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনের সংযোগ রাখার কোনও ব্যবস্থা নেই। আমি সে সুযোগ পেয়েছি বলেই হয়তো আমার জবাবগুলো শিশু-মনের খানিকটা উপযোগী হয়েছে এবং তাঁদের এই অভিজ্ঞতাটুকুর অভাবেই তাঁদের বইতে জবাবটা হয়ে পড়েছে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বা জটিল। তাই সেই বইগুলি ছেলেদের হাতে দিলেও সেটা তাদের মনকে ষোলো-আনা খুশি করতে পারে না—তাদের কোনও আগ্রহ জাগায় না। সেই জন্য সে সমস্ত সাধারণ জ্ঞানের বই অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে পাঠ্য তালিকায় দিলেও কেউ সেগুলি পড়ে না বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে বাজার-চলতি অধিকাংশ সাধারণ-জ্ঞানের বইতে প্রশ্নগুলি সাজাবার ব্যাপারেও খুব কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ ঐ সমস্ত বইতে কোনও বর্ণানুক্রমিক সূচী না থাকায় চট্ করে কোনও প্রশ্ন মনে জাগলে

তার জবাবও খুঁজে পাওয়া যায় না। সাধারণ-জ্ঞানের বইয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী যে কত দরকারী জিনিস তা এদেশের লেখক বা প্রকাশক কেউ ভাবেন নি।

ছোটদের মনে অহরহ যে সব প্রশ্ন জাগে, সেগুলির জবাবই একটু বেশী জটিল, তা হোক না কেন। সেগুলিকেই যতদূর সম্ভব সহজ করে বলবার চেষ্টা করে তাদের কৌতূহলকে তৃপ্ত করা উচিত। 'ওসব বুঝতে পারবে না', বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। সেইজন্য আমি এই বইটিতে সেই সব প্রশ্নের জবাবও দিয়েছি, যা অন্য সকলেই এড়িয়ে গেছেন। তাই বলে যে আগাগোড়া ঐ প্রশ্নগুলির বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী চুল-চেরা বিচার করে দেখাতে সক্ষম হয়েছি তা নয়। এর কারণ সাধারণ মন যতটুকু পর্য্যন্ত বুঝতে পারে ততটুকু 'সাধারণ-জ্ঞানে'র সীমা, তার বাইরে গেলে চলবে না। বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম বিচারে এই কারণে অনেক সময়ে সাধারণ-জ্ঞানের প্রশ্নের জবাবগুলো কিছু কিছু ভুল বলেও মনে হতে পারে, তাতে কিছু এসে যায় না। 'সাধারণ-জ্ঞান' আর বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে ঐটুকুই মূলগত পার্থক্য। এই পার্থক্যটুকু এদেশের সাধারণ-জ্ঞানের বইগুলিতে নেই বলেই সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয়েছে নীরস।

আমার এই বইটিকে দাম এবং প্রশ্ন সংখ্যার হিসাবের বাইরে রেখেই সঙ্কলন করেছি, কারণ মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন 'সাধারণ-জ্ঞান' বল্‌তে যে জিনিসটি বোঝায়, সেটা বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন কৌতূহলের পরিতৃপ্তি। অর্থাৎ ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন বয়সে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের জবাব জানবার জন্য ব্যাকুল হয় এবং সেই সেই বয়সে সেই প্রশ্নের যথাযথ সহজ সমাধান পেলে তবেই তাদের মনন-শক্তি বেড়ে চলে।

কাজেই সেই অনুযায়ী 'সাধারণ-জ্ঞানের'ও একটা পাঠক্রম বা Syllabus থাকা উচিত। অন্য সব দেশের স্কুলে 'সাধারণ-জ্ঞানে'র বই অতিরিক্ত পাঠ্য হিসাবে না পড়িয়ে নিয়মিত পাঠ্য হিসাবে পড়ানো হয়। কোন্ শ্রেণীর ছাত্রদের অন্ততঃ কোন্ কোন্ প্রশ্নের জবাব জানা উচিত তারও একটা

তালিকা রাখা হয়। এই ভাবে তাদের কৌতূহলী মনের রুচি অনুযায়ী মনের খাদ্য পরিবেষণ করা হয়। আমার 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড'কেও আমি সেই ধরণের পাঠক্রম অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করেছি—একটি বইয়ের ভেতর সব কিছু ঢুকিয়ে সস্তায় সকলকে সব কিছু দেবার প্রয়াস পাইনি। জানি না সেদিক থেকে এই বইটিকে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার সার্থকতা এ দেশের শিক্ষকসমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয় উপলব্ধি করবেন কি না।

অন্য দেশের সাধারণ জ্ঞানের বইতে অর্থাৎ যে বইটি যে দেশের ছেলেদের পাঠ্য, সেই দেশ সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন ছেলেদের জানা দরকার—সেই সব প্রশ্ন-গুলিকেই সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়—কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বাংলা দেশের সাধারণ-জ্ঞানের বইতে বাংলাদেশ সম্বন্ধে তেমন বিশেষ বিশেষ দরকারী প্রশ্ন বা তার জবাবের কোনও সন্ধানই মেলে না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দু'-চারখানি বইতে যে দু'একটি প্রশ্ন আছে, তার জবাবও খুব সরল ও বিস্তারিত নয়। অথচ জগতের আজেবাজে সব খবরই আছে সেখানে। এটা কি আমাদের জাতীয় শিক্ষার দৈন্য নয়? তাই আমি এদেশের ছোটদের মনের উপযোগী 'সাধারণ জ্ঞানের' 'পাঠ-ক্রম' বা 'সিলেবাস' তৈরী করে নিয়ে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড'কে নীচের ভাগ অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করেছি ও প্রত্যেক ভাগেই একটি করে বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রে প্রশ্নগুলিকে সাজিয়ে দিয়েছি।

প্রথম ভাগে (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযুক্ত) **আছে** (১) বাঙলা ও বাঙালী (২) তুমি ও তোমার শরীর (৩) জল হাওয়া, আলো, উত্তাপ (৪) গাছপালার জগৎ (৫) জীব-জগৎ (৬) আকাশের রাজত্বের খবর (৭) পাতালের রাজত্বের খবর (৮) পাঁচ-মিশেলী প্রশ্ন।

দ্বিতীয় ভাগে (সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর উপযুক্ত) **আছে** (১) ভারতবর্ষ (২) কোন্ জিনিসটি কি? (৩) কোন্‌টি কবে প্রথম প্রচলন হ'ল? (৪) আবিষ্কারের ইতিহাস (৫) ইতিহাসের খুঁটিনাটি (৬) ভূগোলের নতুন প্রশ্ন (৭) ভাষা ও সাহিত্যের খুঁটিনাটি (৮) পাঁচ-মিশেলী প্রশ্ন।

তৃতীয় ভাগে (নবম ও দশম শ্রেণীর উপযুক্ত) **আছে** (১) পৃথিবীর সবসেরা যা কিছু (২) বিদেশের বিশেষ জ্ঞান (৩) রাষ্ট্র ও রাজনীতি (৪) ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতা (৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতি (৬) বর্ত্তমানের পৃথিবীবিখ্যাত ব্যক্তি ও তাঁদের পরিচয় (৭) বিদেশের সাহিত্য।

এই পাঠক্রম অনুযায়ী সাধারণ-জ্ঞানের বই হিসাবে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড'কে সকলের সামনে উপস্থিত করার প্রস্তাব নিয়ে আমি কলিকাতার কয়েকটি বিখ্যাত স্কুলের শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করি—তাঁরা এবিষয়ে আমাকে সমর্থন করেন এবং তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ, সুসাহিত্যিক অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এবং রাণীভবানী স্কুলের প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ প্রধানশিক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। আর সর্ব্বোপরি সহযোগিতা করেছেন যাদবপুর কলেজ অব্ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেক্‌নোলজির স্বনামধন্য অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক ডক্টর হীরালাল রায়। ডক্টর রায় সানন্দে আমার বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এঁদের সকলের সমবেত সহযোগিতা ছাড়া 'মধুভাণ্ড'কে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা কোনও মতেই সম্ভব হত না—কাজেই এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই বই সঙ্কলনে আমাকে দেশী ও বিদেশী বহু গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হয়েছে, কাজেই সেই সমস্ত গ্রন্থের গ্রন্থকারদের কাছেও আমি চিরঋণী রইলাম।

আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করবো যদি এই বইটি পড়ে আমার ছোট্ট বন্ধুরা খুশি হয়—এবং যদি বইটি এদেশের শিক্ষকসমাজ ও অভিভাবকগণের কাছে কিছুমাত্র আদর পায়।

বিনীত—

'মৌমাছি'

প্রথম সংস্করণ

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, কলিকাতা

৪র্থ সংস্করণের নিবেদন

এই বইটির তিনটি সংস্করণেই প্রায় ৫৫০০ বই বিক্রী হয়ে গত মার্চ্চ মাসেই সব বই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনমত কাগজ না পাওয়ায় ও বইটিতে নতুন নতুন প্রশ্ন সংযোজন ও দোষ ত্রুটি সংশোধনের জন্য ৪র্থ সংস্করণ ছাপাতে দেরি হয়ে গেল। বইটির আকার অনেক বাড়াতে হলো, কাজেই দাম বাড়িয়ে করতে হলো পাঁচ সিকা, কিন্তু কাগজের অভাবে এ বইয়ের চাহিদা অনুযায়ী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছাপানো এবারও সম্ভব হ'ল না। বাঙ্‌লা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্কুলের বহু শিক্ষক যাঁরা এই বইটিকে বাঙলাভাষায় 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধারণ-জ্ঞানের বই' বলে উল্লেখ করে আমায় পত্র দিয়েছেন—তাঁরা সকলেই আমাকে নতুন প্রেরণা দিয়েছেন, সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মে—১৯৪৩ 'মৌমাছি'

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

মাত্র ছয়মাসে এই বইটির ৪র্থ সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ায়—এই বইটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করতে হলো—পঞ্চম সংস্করণে বইটিকে বাড়াবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাগজের অভাবে বাড়াতে পারলাম না। বর্ত্তমানে কাগজের যে অভাব—তাতে পঞ্চম সংস্করণ যে এত তাড়াতাড়ি ছেপে বার করতে পারবো তা ভাবিনি—তা শুধু সম্ভব হ'লো এই সংস্করণটির প্রকাশভার যিনি নিয়েছেন—তাঁর চেষ্টায়। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জানুয়ারী—১৯৪৫ 'মৌমাছি'

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

বাঙলা ও বাঙালী

বাঙলাদেশের নাম 'বঙ্গদেশ' হলো কেন ?

মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে পাওয়া যায়, যে, চন্দ্রবংশে যযাতি বলে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ছেলে অনুর বংশে বলি নামে এক মহাপরাক্রমশালী রাজা জন্মগ্রহণ করেন। এই বলি রাজা ছিলেন ভারি ধার্মিক, তাই দীর্ঘতমা গৌতম বলে এক ঋষি তাঁকে বর দেন যে, রাজার স্ত্রী, রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি মহাবীর জন্মগ্রহণ করবে। হয়েও ছিল তাই, বলি রাজার সেই পাঁচটি ছেলের নাম ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। পরে এই পাঁচ ভাইয়ের নামেই ভারতের পাঁচটি জনপদের নাম দেওয়া হয় অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ, কলিঙ্গদেশ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র দেশ। ভারতবর্ষের এখনকার রাষ্ট্রিক বিভাগ অনুযায়ী অঙ্গদেশ ছিল বিহারের ভাগলপুর বিভাগে, বঙ্গদেশ বলতে বোঝাতো অখণ্ড বাঙলার ঢাকা বিভাগটি, কলিঙ্গদেশ ছিল উড়িষ্যায়, আর সুহ্ম দেশ বা রাঢ়দেশ ছিল বর্দ্ধমান বিভাগে। পুণ্ড্র দেশ ছিল এখনকার উত্তরবঙ্গ বা রাজসাহী বিভাগে।

বিভিন্ন যুগে বাঙলাদেশ কি ভাবে ভাগ করা ছিল ? সেই বিভাগগুলির নাম কি ছিল ?

মহাভারতের যুগে বাঙলাদেশ ৭টি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে ভাগ করা ছিল ; স্বাধীন রাজ্যগুলির নাম ছিল মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশকীকচ্ছ, সুহ্ম

প্রসুহ্ম, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তি। গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় বঙ্গ-রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের অধীন হয়। তারপর সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক বঙ্গরাজ্য আবার উদ্ধার করেন। এই রাজা শশাঙ্কের সময়ে বঙ্গরাজ্য কামরূপ, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি এই পাঁচভাগে ভাগ করা ছিল। তারপর সেনবংশের প্রসিদ্ধ রাজা বল্লাল সেনের সময় বঙ্গরাজ্য মিথিলা, রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ), বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ), বগ্‌ড়ী বা বকদ্বীপ (মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গ) ও বঙ্গ (পূর্ব্ব বঙ্গ) এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা ছিল। মুসলমান শাসনে মোগলযুগে—সুবে বাঙলা—সাতগাঁ, খলিফাতাবাদ, মামুদাবাদ ফতেহাবাদ প্রভৃতি ১৮টি বিভাগে ভাগ করা ছিল।

বাঙালী জাতি আত্মত্যাগ ও একতার বলে কবে সারা আর্য্যাবর্ত্তে বাঙালীর বিজয় নিশান উড়িয়েছিল?

বারোশো বছর আগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টম শতাব্দীতে গোড়ার দিকে বাঙলার বড় দুর্দ্দিন এসেছিল। কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজনীতির ফলে বঙ্গদেশ তখন খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগে বিদেশী রাজারা বার বার বঙ্গদেশ আক্রমণ ক'রে দেশে অরাজকতার ধ্বংসলীলা চালায়। এই অরাজকতা ও অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধারের কোন উপায় না দেখে শেষকালে বাঙালী নায়করা এক হ'য়ে এক সঙ্কল্প করলেন। তাঁরা সকলেই নিজের নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে তাঁদের মধ্যে থেকেই একজনকে দেশের অধিপতি বলে নির্ব্বাচিত করলেন। ইনিই "সর্ব্ববিদ্যাবিৎ" দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র ও 'খণ্ডিতারাতি ব্যপ্যটের' পুত্র রাজা গোপাল। সমস্ত নেতারা এঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন, তাঁদের নিজের নিজের অধিকার ছেড়ে দিয়ে। বাঙালীর এ আত্মত্যাগ ও একতা ব্যর্থ হলো না, দেখতে দেখতে রাজা গোপালদেবের অধীনে বঙ্গদেশ এক শক্তিশালী রাজ্য হয়ে উঠল, সুখ এল, বিদেশী শত্রুরা দূরে সরে গেল। রাজা গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল বঙ্গদেশ থেকে সুদূর সিন্ধু, কান্দাহার ও পাঞ্জাব পর্য্যন্ত সারা আর্য্যাবর্ত্তে

বাঙালীর বিজয় নিশান উড়ালেন। এরপর কান্যকুব্জে যখন তাঁর দরবার হলো সে দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যবন, অবন্তী, ও গান্ধার প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যের রাজারা উপস্থিত হয়ে বাঙালী রাজা ধর্ম্মপালকে সারা আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ বলে স্বীকার করে নিলেন। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালদেব তাঁর পিতার রাজ্য আরও বাড়ান। তিনি কামরূপ (আসাম), গুর্জ্জর (গুজরাট), উৎকলের (উড়িষ্যা) রাজাদের হারিয়ে দিয়েছিলেন। দেবপাল দেবের দু'খানি তাম্রশাসন নালন্দায় ও মুঙ্গেরে পাওয়া গেছে, তা' থেকে জানা যায় যে তাঁর আধিপত্য পশ্চিম সমুদ্র থেকে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত (হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত) বিস্তৃত ছিল। সে সব গৌরবের কথা আজ বাঙ্লার ছেলেরা ক'জন স্মরণ করে ?

প্রাচীন-বাঙলার অতীত গৌরবের প্রধান নিদর্শন কোথায় ? সেগুলি কি ?

পূর্ব্ববাঙলার (পাকিস্তান) অন্তর্গত রাজসাহী জেলার জামালগঞ্জের তিন মাইল পশ্চিমে পাহাড়পুর গ্রামে সম্প্রতি মাটির স্তূপ খুঁড়ে যে বিশিষ্ট ধর্ম্মায়তনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তাই হলো বাঙলার অতীত গৌরবের প্রধান প্রমাণ। এই স্তূপের প্রধান মন্দিরটি গড়ার রীতি ও পরিকল্পনা দেখে পণ্ডিতেরা অবাক হয়ে গিয়েছেন। কারণ ব্রহ্ম, কম্বোজ ও যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলিও এই ছাঁচে গড়া। বাংলা যে পূর্ব্ব এশিয়ায় এককালে সভ্যতা ও প্রভাব বিস্তার করেছিল তা এসব দেখলেই নাকি বোঝা যায়।

বাঙলা সাল কবে থেকে গণনা আরম্ভ হয় ?

বাঙলা সালের বয়স অনুসারে হিসাব করলে মনে হয় যে, গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর যখন বঙ্গদেশ মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কের অধীনে শক্তিশালী হয়ে স্বাধীন বলে সব প্রথম গণ্য হয়, তখন থেকেই বাঙলা সাল গণনা শুরু হয়েছে। কিন্তু আসলে বাঙলা সাল গণনার ইতিহাসটা অন্যরকম—বাঙলা সন এবং মুসলমান 'হিজ্‌রী' সনে কোন প্রভেদ নেই। অর্থাৎ মুসলমানরা

এদেশে রাজত্ব করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের 'হিজ্‌রী' সনই ক্রমে বাঙলাদেশে চলন হয়—এই 'হিজ্‌রী'-সন ৬২২ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা পালানোর ঘটনা থেকেই শুরু হয়েছিল তা সকলেই জানে। 'হিজ্‌রী'-সন চান্দ্রমাস হিসাবে গণনা করা হতো বলে—ফসলের সময় ঠিক করার ব্যাপারে ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের গণনায় নানা অসুবিধা হতো। এই অসুবিধার কথা সম্রাট্‌ আকবর বুঝতে পেরে, তাঁর রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় ১৫৫৬ সাল থেকে সৌর হিসাবে বছর গুণতে আদেশ দেন। অর্থাৎ বাঙলা সনের গোড়ার দিকটা গণনা করা হয়েছে চান্দ্রমতে, এবং পরবর্ত্তীকালে ওটা গণনা করা হচ্ছে সৌর মতে। সেইজন্য বাঙলা সনের হিসেবটা চান্দ্রমতে 'হিজ্‌রী'-সনের সঙ্গে এখন আর মেলে না। কাজেই সন ১৩৫০ সাল বলতে ঠিক ১৩৫০ বছর আগেই সে সনটি আরম্ভ হয়েছে তা ঠিক নয়।

মধ্যযুগে বাঙলাদেশে পাশ্চাত্য জাতি প্রথম কখন আসে?

১৪৯৮ সালে পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডি-গামা উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতে আসার সোজা রাস্তা আবিষ্কার করেন। তাই পর্ত্তুগীজরা তখন প্রাচ্যের বাণিজ্য একচেটিয়া করে নেবার মতলবে ও ভারতবর্ষে আধিপত্য করবার কল্পনায় ভারতের পথে রওনা হন। এই অভিযানে তাঁরা তুরস্ক, মিশর ও অন্যান্য জাতিকে জলযুদ্ধে হারিয়ে ভারতে আসেন। কাজেই পর্ত্তুগীজরাই সব প্রথম বাঙলাদেশেও আসেন। বাঙলাদেশে প্রথম পর্ত্তুগীজ হিসাবে এদের চারজনের নাম জানা যায়, পাদরী ফ্রান্সিস্‌ ফার্ণান্‌ডিজ, ডোমিনিকো ডি জোসা, মেলাকিওর ফন্‌সেকা ও এন্‌ড্রু বাউয়েস্‌। সম্রাট আকবরের কাছ থেকে ১৫৩৭ খ্রীঃ অব্দে পর্ত্তুগীজরা বাঙলার প্রাচীন 'সপ্তগ্রাম' ও 'হুগলী' প্রভৃতি কেন্দ্রে বাণিজ্য করবার অনুমতি পান ও হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেন। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাতে তখনই বাঙলার নিজস্ব সামুদ্রিক বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। পর্ত্তুগীজদের দেখাদেখি ঐ পথ দিয়ে ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসীরাও এল এদেশে।

বাঙলাদেশে ইংরেজেরা কি ভাবে সবপ্রথম আসে ?

ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজরা ভারতের মশলা ও কাপড়-চোপড় বিলাতে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতো ; দু'গুণ দাম দিয়ে চড়া দরে এইসব কিনতে হচ্ছে দেখে ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজদের টনক নড়ল। তাই তাঁরা ভারতে বাণিজ্য করবার জন্য সত্তর হাজার পাউণ্ড মূলধন নিয়ে একজন গভর্ণর ও কয়েকজন ডিরেক্টরের অধীনে একশো পঁচিশ জন ইংরেজ বণিক মিলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম দিয়ে এক কোম্পানী গড়া ঠিক করলেন, ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর এই কোম্পানীর সূত্রপাত হ'ল। রাণী এলিজাবেথ তাঁদের সনন্দ বা হুকুমনামা দিলেন। এরপরেই ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দে জন মিডেল হল বলে এক ইংরেজ কতকগুলি বিলাতী মণিরত্ন আর সুন্দর সুন্দর ঘোড়া উপহার নিয়ে ভারতের সম্রাট আকবরের দরবারে হাজির হলেন। কিন্তু তিনি পর্ত্তুগীজ পাদ্রীদের চক্রান্তে সম্রাট আকবরের দরবারে হাজির হয়েও বড় বেশী সুবিধা করতে পারলেন না। এর পর ১৬০৯ খ্রীঃ অব্দে এলেন হকিন্স সাহেব, তিনি ফারসী ভাষা জানতেন, এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরকে দেবার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন মেলাই মণিরত্ন উপহার। আড়াই বছর ধরে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের মন জুগিয়ে তোষামোদ করে, শেষে অনেক কষ্টে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করবার অনুমতি পেয়েছিলেন। এরপর ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে এলেন স্যার টমাস রো, তিনিও নানা উপহার সঙ্গে এনেছিলেন। এই সব উপহার দিয়ে দিল্লীর দরবার থেকে ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে আগ্রায় ও ১৬২৩ খ্রীঃ অব্দে পাটনায় কুঠি খুলবার অনুমতি পান। এ ছাড়া শোনা যায় ১৬৩৪ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজ ডাক্তার ব্রাউটন, সম্রাট শাজাহানের মেয়ে ও বাঙলার শাসনকর্ত্তা সুলতান সুজার বেগমের অসুখ সারিয়ে দিয়েই বিনা শুল্কে বাঙলাদেশে বাণিজ্য করার অনুমতি পান। এরপরে ১৬৪১ খ্রীঃ অব্দে হুগলীতে ও ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে কাশিমবাজার, পাটনা ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করে সোরা ও রেশমের ব্যবসাতে কোম্পানী অনেক লাভ করে।

এইভাবে ব্যবসা করার ছুতায় ইংরেজরা প্রথম বাঙলাদেশে তাদের আস্তানা গাড়ে।

বাঙলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত কে করে এবং কবে?

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর মীরজাফর নবাব হন, এই মীরজাফরের মৃত্যুর পর ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট লর্ড ক্লাইভ মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পান এবং বাঙলার নবাব নজম্উদ্দৌলার কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয়ে বাঙলার স্থবেদারী পান। এর পরের বছরই লর্ড ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে দরবার করে নবাবের পাশে দেওয়ান হয়ে ব'সে প্রথম পুণ্যাহ উৎসব করেন। এর কিছুদিন পরে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে নজম্উদ্দৌলা হঠাৎ মারা যান এবং তাঁর ১৬ বছরের ভাই সৈফ্উদ্দৌলা নায়েব নাজিম হন। এই সময়েই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বিলাতের পার্লামেণ্ট সভার একটা বোঝা-পড়া শুরু হয়, এবং ১৭৬৬ সালেই সাব্যস্ত হয় যে ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে যে দেওয়ানী পেয়েছে তা ইংলণ্ডের রাজার প্রাপ্য। এই ব্যবস্থা অনুসারে ১৭৬৬ সাল থেকে ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সঙ্গে সর্ত্ত হয় যে তাঁরা পার্লামেণ্টকে বছরে চার লক্ষ পাউণ্ড কর দেবেন এবং তাছাড়া আরও চার লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের বিলাতী পণ্য কিনে এনে ভারতবর্ষে বেচবেন। এর পরেই ১৭৭২ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলকাতায় ফিরলেন। এই ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়েই ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেণ্টের প্রভুত্বটাও কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার সঙ্গে বাঙলা তথা ভারতের বুকে ভালো ভাবেই দেখা দিল। তিনিই বাঙলার ও বিহারের নায়েব নাজিমদের বরখাস্ত করে, রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরেজ কর্ম্মচারী বা কালেক্টর নিযুক্ত করলেন। কলিকাতায় এক রেভিনিউ বোর্ড খাড়া করে রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় সরিয়ে আনলেন। ১৭৭৪ সালে যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথম গভর্ণর জেনারেল হয়ে কাউন্সিল গড়ে ইংরেজী শাসন ও বিচার ব্যবস্থার স্থত্রপাত

করলেন, তখনই ব্যবসা বাণিজ্য থেকে বাঙলাদেশে ইংরেজদের দেওয়ানী রাজ্যপাট গড়ে উঠল। ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোম্পানীর শাসন এদেশে চালু ছিল।

বাঙলা ভাষা কোথা থেকে ও কেমন করে এল ?

বাঙলাভাষার জন্ম নিয়ে যে সব ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁরা আন্দাজ করে বলেন যে ২০০ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে ইণ্ডো-এরিয়ান-ভাষার শাখা প্রাকৃত-ভাষার চল ছিল, সেই ভাষা থেকেই এসেছে বাঙলাভাষা, কিন্তু এই ভাষার মূল হল সংস্কৃত। তারপর ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'মাগধী'-অপভ্রংশের রূপ নেয় এবং সেটাই খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রাচীন বাঙলায় রূপান্তরিত হয়। পরে প্রাকৃত, মৈথিলী, ফারসী, উর্দ্দু, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার বহু শব্দ বাঙলাভাষার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে বাঙলাভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভাষার তুলনায় বাঙলাভাষার সাহিত্য বর্ত্তমানে সবচেয়ে উন্নত—তাছাড়া বাঙলাভাষা হল ছয়কোটি লোকের মাতৃভাষা। অন্য কোনও প্রাদেশিক ভাষাকে এত লোক মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে না। তবে বর্ত্তমানে বাঙলাদেশ দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ভারতের অংশে পড়েছে মাত্র দু'কোটি বাঙলা ভাষা-ভাষী লোক। বাঙলাভাষা বলতে যা আমরা বর্ত্তমানে সবাই বুঝি, এর বয়স আন্দাজ সাড়ে ছ'শো বছর, তার আগেকার বাঙলাভাষা বলতে যা পাওয়া যায়, তা নাকি বর্ত্তমানের বাঙালীরা বুঝতে পারে না।

বাঙলাভাষায় আদি কাব্য কি ? আদি কবি কে ?

বাঙলাভাষায় কৃত্তিবাসকেই 'আদি কবি' বলা হয়, কারণ পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন কৃত্তিবাস রচিত 'ভাষা রামায়ণই' বাঙলাভাষার আদি কাব্য। তবে এ নিয়ে মতভেদ অছে যথেষ্ট। এই কৃত্তিবাস কবির পুরো নাম 'কৃত্তিবাস ওঝা,' ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার দিন কলিকাতা থেকে ৫০ মাইল দূরে রাণাঘাটের কাছে ফুলিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

বাঙলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচলন হ'ল কবে ?

১৮৩৩ সালে ব্রিটিশরাজ পুরাপুরিভাবে ভারতের শাসনভার হাতে নিলেন। তখনই ঠিক হল যে ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। এর আগে ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে শিক্ষার তেমন কোনও ব্যবস্থাই এদেশে হয়নি, তবে ১৮১৮ সালে কলিকাতা স্কুল সোসাইটী স্থাপিত হয়, এবং সেই ১৮১৮ সালেই শ্রীরামপুরের কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ সালে কাছারীতে ফার্সীর বদলে প্রথম ইংরেজীর চল হল। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন যে গভর্ণমেণ্ট ইংরেজী স্কুলে যারা পড়েছে, তারাই শুধু সরকারী চাকরী পাবে, তাই চাকরীর লোভে তখন থেকেই এদেশের লোকের ইংরেজী শেখবার আকাঙ্ক্ষাটা খুবই বাড়ল।

বাঙলাভাষায় প্রথম ছাপা বই কি ?

বাঙলা অক্ষরে সব প্রথম যে বই ছাপা হয়, সেটি একটি বাঙলা ব্যাকরণ। এটি রচনা করেন মিঃ হালহেড্ বলে একজন ইংরেজ—সেটা ছাপা হয় ১৭৭৮ সালে। এই হালহেড্ সাহেবই ইংরেজদের মধ্যে সবপ্রথম বাঙলাভাষায় পণ্ডিত হয়েছিলেন। এর আগে ১৭৩৪ সালে পর্তুগীজরা লিস্‌বন শহরে ইংরেজী অক্ষরে বাঙলাভাষায় একটা বই ছেপেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বাঙলাভাষার গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস কি ?

খুব প্রাচীন বাঙলা-গদ্যের নমুনা পাওয়া যায় না। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে গদ্য অচল ছিল। তখন সব কিছু কাব্যের আকারেই লেখা হতো ; কিন্তু সেকালের চিঠি ও দলিলপত্রে এক ধরনের গদ্য প্রচলিত ছিল। বইয়ের আকারে আজ পর্য্যন্ত যে-সব প্রাচীন বাঙলা-গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র', ১৮০১ সালে তিনিই মৌলিক গদ্যের প্রথম সৃষ্টি করেন এদেশে—এই গ্রন্থ রচনা ক'রে। পর্তুগীজ পাদ্রী,—'ফ্রে ম্যানুয়েল দ্য আসাম্পো'র লেখা 'কৃপার শাস্ত্রের

অর্থভেদ'ও প্রাচীন বাঙলা-গদ্যের একখানি উল্লেখযোগ্য বই। তারপর বাঙলা-গদ্য রাজা রামমোহনের হাতে নতুন উৎকর্ষ লাভ করে। এবং পরবর্ত্তী কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী বাঙলাভাষাকে গদ্য আকারে সাহিত্যের উপযোগী করে তোলেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাঙলা সাধু ভাষায় রচিত গদ্য-সাহিত্য খুবই উন্নত হয়।

বাঙলাদেশে প্রথম থিয়েটার বা প্রমোদাগার কবে তৈরী হয় ?

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হওয়ায়, তারাই কলিকাতায় আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা ক'রে প্রথম ইংরেজী ধরণের থিয়েটার তৈরী করে।

বাঙলাদেশে প্রথম ছাপাখানা কোথায় হয় ?

বাঙলাদেশে সবপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় হুগলীতে ; পঞ্চানন কর্ম্মকার ও মনোহর দাসের সহযোগিতায় উইল্‌কিন্স সাহেব এই কাজটি করেন। এখান থেকেই হাল্‌হেড সাহেবের 'বাঙলা ব্যাকরণ' ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়।

বাঙলাভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-পত্রিকা কি ?

বাঙলাভাষায় উল্লেখযোগ্য প্রথম 'সাহিত্য-পত্রিকা' 'বঙ্গদর্শন'। এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

বাঙলাদেশে গোল টাকা ও তামার পয়সার প্রচলন কবে হয় ?

বাঙলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বকালে চারচৌকা খাঁটি রূপার মুদ্রা চলতি ছিল, এবং সেই মুদ্রাই ব্যবসা বাণিজ্যে ওজন ও মাপের মান ছিল। পাশাপাশি চব্বিশটি মুদ্রা রাখলে মাপ হতো একহাত, ও একশো মুদ্রা এক-সঙ্গে করলে যে ওজন হতো তাই হতো একসের। এই সব মুদ্রাতেও রাজাদের নাম লেখা থাকতো। মোগল রাজত্বের সময় সবপ্রথম গোল চেহারার টাকার প্রচলন হয়, ও তুরাণী ভাষার 'তঙ্কা' শব্দ থেকেই 'টাকা'

কথাটির উৎপত্তি। তখন এদেশে সিকি, দুয়ানি, আনি বা অধুলি প্রভৃতি মুদ্রা ছিল না। টাকা ভাঙিয়ে নিতে হতো কড়ি, সেই কড়ি দিয়েই কেনাবেচা চলতো ; কিন্তু এক টাকা ভাঙিয়ে যে পরিমাণ কড়ি পাওয়া যেতো তা বয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল এক মুস্কিলের ব্যাপার। তাই টাকা ভাঙিয়ে তামার পয়সা দেওয়ার প্রচলন করেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। সেকালে এই তামার পয়সাকে 'ঢেপুয়া' বলত—এক টাকার বদলে ১৬ গণ্ডা বা ৬৪টি 'ঢেপুয়া' পাওয়া যেতো, এবং এক 'ঢেপুয়া'র বদলে পাওয়া যেতো ২০ গণ্ডা কড়ি।

ইংরেজরা এদেশে কবে প্রথম টাকা তৈরী করে ?

ইংরেজরা ১৭৫৭ সালে প্রথম কলিকাতার টাকশালে 'আলিনগর' নামাঙ্কিত টাকা তৈরী করে।

বাঙলাদেশে কাগজের মুদ্রা বা নোটের প্রচলন প্রথম হয় কবে ?

১৭৮৫ সালে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারীদের সই করা পঞ্চাশ, একশো ও পাঁচশো টাকার ও এক মোহর দামের নোট সাধারণের কাছে চালু করা হয়।

বাঙলাদেশে পয়সার বদলে আনির প্রচলন হলো কবে ?

১৭৭০ সালের ১০ই অক্টোবর তামার পয়সার বদলে চারটি পয়সা এক ক'রে 'আনি' বলে এক নতুন ধরণের মুদ্রা চলতি হয়। কিন্তু এই আনি তৈরীর প্রস্তাব প্রথমে করেন ইঞ্জিনীয়ার রোইয়ার সাহেব ১৭৫৭ সালে।

বাঙলাদেশে সব প্রথম ডাকঘরের সৃষ্টি হয় কবে ?

সম্রাট 'শেরসাহ'ই সব প্রথমে এদেশে ডাকঘরের সৃষ্টি করেন, কিন্তু তখন এখনকার মত টিকিট দিয়ে মাশুল আদায় করবার ব্যবস্থা ছিল না, দূরত্ব অনুসারে ডাক বয়ে নিয়ে যাওয়ায় মাশুলের হার কম-বেশী হতো। রাজা ও জমিদারের চিঠিগুলিই কেবল ঠিকানামত বিলি করার ব্যবস্থা ছিল, অন্যান্য লোককে মাশুল দিয়ে ডাকঘর থেকে চিঠি নিয়ে আসতে হতো। তখন সমস্ত শহর ও সদর কশ্‌বাতে ডাকঘর ছিল।

বাঙলাদেশে রেলপথ ও ষ্টীমার পথ কবে থেকে শুরু হয় ?

বাঙলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, কাজেই প্রাচীনকালে বাঙাদেশে জলপথেই যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য বেশীরভাগ চলতো ; তবে স্টীমারের চল তখনও হয়নি, বজরা, নৌকা, ছিপ, ডিঙি, এই সব নানারকমের জলযান তখন এদেশে ছিল। স্টীমার-পথ খোলা হয় সবপ্রথম ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে। ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী কলিকাতা আর গৌহাটীর মধ্যে এই স্টীমার-পথ খোলেন। ইস্ট-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ে-কোম্পানীর নামে এক ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে হাওড়া থেকে হুগলী পর্য্যন্ত ২৩ মাইল রেলপথ খোলেন। বাংলাদেশে এই প্রথম রেলপথ।

বাঙলাদেশে প্রথম বাষ্প চালিত জাহাজ কবে দেখা যায় ?

বাঙলাদেশে প্রথম বাষ্পচালিত যে জাহাজটি আসে তার নাম 'এণ্টার্‌প্রাইজ'। ১৮২৮ সালে সেটি সমুদ্রে দেখা দেয়।

বাঙলাদেশে কবে প্রথম টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা হয় ?

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী কলিকাতা থেকে ডায়মণ্ড-হারবার অবধি যে টেলিগ্রাফ লাইনের ব্যবস্থা হয় সেই ব্যবস্থাই এদেশের সব প্রথম টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা।

বাঙলাদেশে প্রথম কোথায় 'টেলিফোন' ব্যবস্থার চল হয় ? এবং কবে ?

১৮৮২ সালে বাঙলাদেশে—কলিকাতা শহরে সবপ্রথম টেলিফোনে কথা বলার ব্যবস্থা হয়, তখন মাত্র ৫০ জন ধনী লোক এই যন্ত্রের গ্রাহক ছিল।

বাঙলাদেশে সবপ্রথম ট্রামগাড়ী চলতে শুরু করে কবে থেকে ?

সবপ্রথম ট্রাম লাইন খোলা হয় কলিকাতার চৌরঙ্গী, চিৎপুর আর শিয়ালদহ অঞ্চলে। সেটা হল ১৮৮১ সালের কথা। তারপর ১৮৮৪ সালে মধ্য-কলিকাতার বাঁধানো রাস্তায় রাস্তায় ট্রাম লাইন ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তখনকার

সেই ট্রাম গাড়ী এখনকার মত বিদ্যুতের সাহায্যে চলতো না। অস্ট্রেলিয়া দেশ থেকে বড় বড় ঘোড়া আনিয়ে এই ট্রাম গাড়ী টানানো হতো। কিন্তু ঘোড়াগুলো গরমে পটাপট মরছে দেখে তখন চেষ্টা হল বাষ্পচালিত ইঞ্জিন দিয়ে ট্রাম চালাবার, তাও তখন সুবিধে হলো না। শেষকালে ১৯০০ সালে বিদ্যুতের সাহায্যে ট্রাম চালাবার ব্যবস্থা হল কলিকাতার রাস্তায়। এই ব্যবস্থায় ব্যবসা ভাল চলল দেখে ট্রাম-কোম্পানী ১৯০০ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে কলিকাতার দিকে দিকে ট্রাম গাড়ীর ব্যবস্থা করলেন।

বাঙলাদেশে ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের ব্যবহার ও বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও প্রতিবাদ সবপ্রথম শুরু করেন কে ?

বাঙালী হিন্দুরাই সবপ্রথম পাদ্‌রী ও ইংরেজ ভদ্রলোকদের সাহায্যে ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কারণ তখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা বা ইউরোপের ভাবধারা সম্বন্ধে জ্ঞান দেবার জন্য কোম্পানীর লোকদের কোনও আগ্রহই ছিল না। যাই হোক বাঙালী হিন্দু যুবকেরা ইংরেজীভাষা শিখে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ইউরোপের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ খুঁজে পেলেন, এবং তখন থেকেই তাঁরা ইংরেজ শাসনকর্ত্তাদের ব্যবহার ও বিধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে আরম্ভ করলেন। বাঙলার যুবকদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হলো তখন থেকেই, এবং সেই রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়ই সবপ্রথম উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি সে-যুগে কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার খুব তীব্র সমালোচনা করেন, এমন কি তিনি বিলাতে গিয়েও কোম্পানীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন।

বাঙলাভাষায় প্রথম সংবাদপত্র কি ?

বাঙলা ভাষায় প্রথম যে সংবাদপত্রটি ছাপা হয়, যতদূর জানা যায় নাম তার 'সমাচার দর্পণ'। ১৮১৮ সালের ২৯শে মে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ বলেন 'বেঙ্গলী গেজেট' এর আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

বাঙলা-সাহিত্যের স্থান কোথায় ?

বাঙলা সাহিত্য ভারতের বর্ত্তমান সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। বিশ্বসাহিত্যেও বাঙলাসাহিত্যের স্থান অন্যান্য দেশের সাহিত্যের অনেক উপরে।

বাঙলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলন করেন কে ?

বাঙলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলন করেন সবপ্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বাঙলা সাহিত্যে সব চেয়ে বেশী দান কার ? বর্ত্তমান যুগকে বাঙলা-সাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ বলা হয় কেন ?

বাঙলাসাহিত্যে সবচেয়ে বেশী রকমের ও সংখ্যাতেও সবচেয়ে বেশী বই লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, দর্শনতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু বই লিখেছেন। এ ছাড়া, শিশুদের জন্যও অনেক মজার মজার বই লিখেছেন। বাঙলাসাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ হল 'রবীন্দ্রনাথের যুগ', কারণ রবীন্দ্রনাথই তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ করে নোবেল পুরস্কার দ্বারা বিশ্বসাহিত্যে সুপরিচিত হন। বাংলা সাহিত্যকে তিনিই বিশ্বসাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বাঙলাভাষার প্রথম উপন্যাস কি ?

টেকচাঁদ-ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলাল' বলে যে উপন্যাসটি লেখেন সেটি বাঙলাভাষায় প্রথম মৌলিক উপন্যাস। টেকচাঁদ ঠাকুর বলে কোন লোকই ছিল না, আসলে ওটি হল প্যারীচাঁদ মিত্রের 'ছদ্মনাম'।

বাঙলায় সবপ্রথম জাতীয়-সঙ্গীত কোনটি ?

বাঙলাদেশের বর্ণনা দিয়ে বঙ্গজননীর বন্দনায় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে-মাতরম্' বলে যে সুন্দর গানটি রচনা করেন, সেটিকেই সব প্রথম ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয় এবং সেটিই বর্ত্তমানে

ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিও ইদানীং জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে অনেকে গেয়ে থাকেন।

বাঙলাসাহিত্যের প্রথম নাট্যকার কে ?

অনেকে রামনারায়ণ তর্করত্নকেই বাঙলা সাহিত্যেরপ্রথম নাট্যকার আখ্যা দেন, কারণ তিনিই প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ধরনে সবপ্রথমে বাঙলাভাষায় নাটক লেখেন—তাঁর প্রথম নাটক, "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে রচিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, তার বহু আগেই নন্দকুমার রায় রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা,' 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী,' 'হাস্যার্ণব,' 'কৌতুক-সর্ব্বস্ব', তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস,' কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু'-নাটক প্রভৃতি নাটকের চল ছিল। তবে সেগুলি বিয়োগান্ত নাটক, সুতরাং এদেশের রীতিবিরোধী ব'লেই বাঙলা সাহিত্যে গৃহীত হয়নি।

থিয়েটারে বাঙলা-নাটকের অভিনয় প্রথম কবে হয় ?

প্রথম বাঙলা-নাটকের অভিনয় হয় ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে—হেরাশিম লেবেডফ (Herassim Lebedoff) নামে একজন রুশ দেশের লোক এক নাট্যসমিতি খোলেন, সেখানেই Disguise ও Love is the best doctor বলে দু'খানি ইংরাজী নাটকের বাংলা অনুবাদ-নাটক অভিনীত হয়। এই হলো থিয়েটারে বাঙলা-নাটকের প্রথম অভিনয়।

বাঙলাভাষায় প্রথম শিশু-মাসিক-পত্রিকা কবে প্রকাশিত হয় ?

যতদূর জানা যায় প্রথম বাঙলা শিশু-মাসিক-পত্র 'সখা' প্রকাশিত হয় বাংলা ১২৮৯ সালে, প্রকাশ করেন স্বর্গত প্রমদাচরণ সেন।

বাঙলাদেশে দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন কবে হয় এবং কে করেন ?

জানা যায় যে তাহিরপুরের জমিদার বংশের রাজা কংসনারায়ণই পণ্ডিতদের ব্যবস্থা অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রথম এদেশে

শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন করেন। পণ্ডিতরা পুরাণ পুঁথি ঘেঁটেই এ ব্যবস্থা দিয়েছিলেন।

বাঙলা-সাহিত্যে ছোটদের উপযোগী লেখা লিখে কে কে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন ?

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার রায় চৌধুরী, নিশিকান্ত সেন, সুখলতা রাও, সুনির্ম্মল বসু, সুবিনয় রায়চৌধুরী, প্রভৃতি।

বাঙলার প্রধান নগরী কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস কি ?

কলিকাতা মহানগরীর ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। আড়াইশো বছর আগে এই কলিকাতা শহর একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই নগরীর উন্নতি হয়। কিন্তু 'কলিকাতা' নামের সবপ্রথম উল্লেখ পাওয়া গেছে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের পাতায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা রাজা টোডরমল্লের খাজ্‌না আদায়ের খাতাতেও 'মহাল কলিকাতা' ব'লে উল্লেখ আছে।

এখন খাস কলিকাতা বলতে যে জায়গাটি বোঝায়, আগে ঐখানে সুতানুটি গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটি বিভিন্ন গ্রাম ছিল। কলিকাতায় ও সুতানুটিতে ইংরেজ আমলের আগে তাঁতের কাপড়ের সুতা বিক্রী করার জন্য একটী বড় হাট ছিল। এই সুতানুটিতেই ১৬৯০ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে অগাষ্ট জব চার্ণক প্রথম আসেন এবং তখনই সুতানুটিতে ইংরেজরা কুঠি তৈরী করে ব্যবসা শুরু করার মতলব করেন। মহানগরী কলিকাতার পত্তন বাস্তবিক পক্ষে সেইদিন থেকেই শুরু হয়।

বাঙলাদেশের প্রথম লাইব্রেরী কোনটি ?

বাঙলাদেশে জনসাধারণের জন্য আধুনিক কালে প্রথম যে লাইব্রেরী হয়, তার নাম হচ্ছে 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী'; এটা স্থাপিত হয় ১৮৩৯

সালে—মেটকাফ হাউস বলে একটা বাড়ীতে, পরে ১৯০০ সালে সেটা গভর্ণমেণ্টের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সঙ্গে এক হয়ে যায়।

বাঙলাদেশে কোথায় এবং কবে প্রথম পাথরে বাঁধানো রাস্তা তৈরী হয়?

১৭৯৪ সালে কলকাতা শহরে সবপ্রথম পাথর বাঁধানো রাস্তা তৈরী হয়।

বাঙলাদেশে কবে সবপ্রথম ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বলে?

১৮৯৯ সালের ৩০মে কলিকাতায় সবপ্রথম ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে।

বাঙলাদেশে কোথায় কবে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়?

১৮০৪ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়। এ খেলাটা হয়েছিল ইটোনিয়ান সিভিল সার্ভেণ্টস্ আর এখানকার বাছাই-করা সাহেবদের একটা দলের মধ্যে।

বাঙলাদেশের ফুটবল খেলার ইতিহাস কি?

১৮৭৭ সালে সব প্রথম গড়ের মাঠে ইংরেজ সৈন্যেরা ফুটবল খেলার আমদানী করে। তাদের খেলা দেখে হেয়ার স্কুলের একটি ছাত্র নাম নগেন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, তার মাথায় ঢুকল ঐ রকম একটা দল গড়ে ফুটবল খেলা শেখা। নগেন্দ্রপ্রসাদ হেয়ার স্কুলের ছেলেদের নিয়ে দল গড়ে ফুটবল খেলা শুরু করলেন—পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক Mr. Stack আর Mr. Gilligan-এর চেষ্টায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররাও ফুটবল খেলার দল গড়লে। এদের দেখাদেখি সেণ্ট জেভিয়ার্স ও হিন্দু-স্কুলের ছেলেরা এদের দলে এসে যোগ দিলে, এবং একটা নতুন সম্মিলিত দল গড়লে।

বাঙলাদেশে ঘোড়দৌড় খেলা কবে আরম্ভ হয়?

১৮০৮ সালে এদেশের ধনীদের নতুন জুয়ায় প্রলুব্ধ করবার উদ্দেশ্যেই বেঙ্গল জকী ক্লাবের সাহেবদের চেষ্টায় এদেশে ঘোড়দৌড় খেলা আরম্ভ হয়।

তখন কলিকাতার কিছু দূরে আকনায় ছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমানের ঘোড়দৌড়ের মাঠ—ক্যালকাটা রেস্‌কোস তৈরী হয়।

বাঙলাদেশের মানচিত্র সবপ্রথম কবে আঁকা হয়?

প্রাচীন ভারতে চোল রাজারা ও সম্রাট্ আকবর এদেশের জরীপ করিয়েছিলেন এ প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জরীপের ফল কোন মানচিত্র তৈরী করে দেখান হয় নি। ভারতবর্ষের 'ম্যাপ' আঁকেন সবপ্রথম ১৭৫১ সালে একজন ফরাসী ভূগোলবিৎ, তার নাম 'ডি এ্যান্‌ভিল'। বাঙলাদেশের ম্যাপ প্রথম আঁকা হয় ১৭৮১ সালে। যিনি এই ম্যাপ আঁকেন—তাঁর নাম মেজর জেমস্ রোণেল—ইনি লর্ড ক্লাইভের অধীনে চাকরী করতেন। ইনিই ভারতীয় ভূগোলের স্বষ্টিকর্ত্তা।

বাঙলাদেশে বিলাতী ধরনের বাজার প্রথম কবে খোলা হয়?

১৮৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী স্যার স্টুয়ার্ট হগের নামে যে বাজারটি খোলা হয় সেটিই বাঙলা দেশের সর্বপ্রথম বিলাতী ধরনের বাজার। বর্ত্তমানেও এই বাজারটি 'হগ্ সাহেবের বাজার' বলেই পরিচিত।

বাঙালীর গৌরবে ভারতবর্ষ গরীয়ান কেন?

ভারতীয় সমস্ত জাতির মধ্যে বাঙালীরা সকল বিষয়ে সব সময়েই অগ্রণী, তাই বাঙালীর গৌরবে ভারতবর্ষ গরীয়ান। যেমন বলতে পার,—

(১) বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম নোবেল প্রাইজ পান।

(২) বাঙালী রামমোহন রায় বিশিষ্ট ভারতবাসীদের মধ্যে সবপ্রথম বিলাত যান।

(৩) বাঙালী সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ভারতবাসীদের মধ্যে সবপ্রথম গভর্ণর ও বিলাতে লর্ডস্ সভার সভ্য হন।

(৪) বাঙালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হন।

(৫) বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম গ্র্যাজুয়েট হন।

(৬) বাঙালী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম I.C.S. হন।

(৭) বাঙালী চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম মেয়রের সম্মান লাভ করেন।

(৮) বাঙালী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারের সম্মান লাভ করেন।

(৯) বাঙালী দিগম্বর মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম শেরিফের সম্মান লাভ করেন।

(১০) বাঙালী স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মান লাভ করেন।

(১১) বাঙালী নীলমণি মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম ইঞ্জিনীয়ার হন।

(১২) বাঙালী মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম ইংরাজী ভাষায় ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লেখেন।

(১৩) বাঙালী স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম এ্যাডভোকেট জেনারেল হন।

(১৪) বাঙালীর মেয়ে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি-এ ও চন্দ্রমুখী বসু এম-এ, এই দু'জনেই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সবপ্রথম গ্র্যাজুয়েট হন। এবং কাদম্বিনী গাঙ্গুলীই ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সবপ্রথম ভারতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন।

(১৫) বাঙালীর মেয়ে চন্দ্রলেখা বসু ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে সবপ্রথম বিলাতে যান।

(১৬) বাঙালীর মেয়ে তরু দত্ত ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে সবপ্রথম ইংরেজী ভাষায় কবিতা লেখেন।

(১৭) বাঙালীর মেয়ে প্রভাবতী দাশগুপ্তা ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে সব প্রথম বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পি-এইচ-ডি' উপাধি লাভ করেন।

(১৮) বাঙালী উদয়শঙ্কর ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম ভারতীয় নৃত্য দেখিয়ে দেশবিদেশে সম্মান লাভ করেন।

(১৯) বাঙালী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সবপ্রথম ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রকে জগতের সমক্ষে তুলে ধরেন।

(২০) বাঙালী আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম ভারতীয় যিনি জগতে প্রমাণ করেন যে গাছপালা এদেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে।

(২১) বাঙালী কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বার হন।

(২২) বাঙালী আনন্দমোহন বসু ভারতীয়দের মধ্যে সবপ্রথম Wrangler উপাধি প্রাপ্ত হন।

(২৩) বাঙালী হরিনাথ দে ভারতবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রকম ভাষা জানতেন।

(২৪) বাঙালী রমাপ্রসাদ রায় ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম হাইকোর্টের জজ হন।

(২৫) বাঙালী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রথম সাংবাদিক।

(২৬) বাঙালী দুর্গাচরণ লাহা ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পোর্ট কমিশনারের সভ্য হন।

(২৭) বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয়দের নিয়ে সবপ্রথম সুসংগঠিত 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' বা 'স্বাধীন ভারত বাহিনী' গড়ে—ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেন—ও মণিপুর সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হন।

(২৮) বাঙালীর মেয়ে প্রীতি ওয়াদ্দেদার ভারতের বিপ্লব আন্দোলনে ভারতের প্রথম মেয়ে শহিদ।

(২৯) বাঙালীর ছেলে সুব্রত মুখার্জ্জী প্রথম ভারতীয় যিনি বিমান-বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়করূপে কাজ করেন।

(৩০) বাঙালী শিল্পী রণদা উকীল, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মন, সুধাংশু রায় চৌধুরী ও ললিতমোহন সেন ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিলাতের 'ইণ্ডিয়া হাউস' চিত্রিত করবার সম্মান লাভ করেন।

কোন্ কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ বাঙালী স্বনামধন্য হয়েছেন ?

সাহিত্যে—কৃত্তিবাস ওঝা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, রামপ্রসাদ সেন, দাশরথি রায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চন্দ্রাবতী, রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, স্বভাবকবি গোবিন্দদাস, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, জলধর সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, গোকুল নাগ, 'পরশুরাম, (রাজশেখর বসু) প্রমথ চৌধুরী, নরেশ সেনগুপ্ত, কেদার বন্দ্যোপাধ্যয়, রবীন্দ্র মৈত্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় কুমুদরঞ্জন মল্লিক, গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী, বিজয়লাল চট্টো-পাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, কামিনী রায়, অনুরূপা দেবী, রাধারাণী দেবী, মোজাম্মেল হক, মরহুম মশবুরফ হোসেন, মোহিতলাল মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, কালিদাস রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, 'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাণিক

বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মৌলভী রেজাউল করিম।

(২) **বিজ্ঞানে**—জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্র বসু, বিরজা শঙ্কর গুহ, শিশিরকুমার মিত্র, দেবেন্দ্রমোহন বসু, কুদরতে খোদা।

(৩) **ইতিহাসে**—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দুর্গাদাস লাহিড়ী, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র নাথ সেন, ননীগোপাল মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমাপ্রসাদ চন্দ্র, রামপ্রাণ গুপ্ত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

(৪) **শিল্প-কলায়**—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, অতুল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুলচন্দ্র দে, সারদা উকীল, অসিতকুমার হালদার, রমেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

(৫) **সঙ্গীত-কলায়**—রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু), গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, অতুলপ্রসাদ সেন, লালচাঁদ বড়াল, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, দিলীপকুমার রায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্ম্মন, সাহানা দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক, উত্তরা দেবী, শৈল দেবী।

জাতীয়-আন্দোলনে—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, লালমোহন ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, সরলা দেবী, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অম্বিকা মজুমদার, রাসবিহারী ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, হরদয়াল নাগ, সরোজিনী দেবী (নাইডু), আবদুল রসুল, আবদুল হালিম গজনভী,

আবদুল শোভান চৌধুরী, খাজা আতিকুল্লা, রাসবিহারী বসু, তারকনাথ দাস, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, জনাব ফজলুল হক, মৌলভী নৌশের আলি, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ সুরেশচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অরুণা আসফ আলি, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন দাস, সোমনাথ লাহিড়ী, সুচেতা কৃপালনী।

(৮) **ব্যবসা-বাণিজ্যে**—রামদুলাল সরকার, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বটকৃষ্ণ পাল, কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, আলামোহন দাস।

(৯) **চিকিৎসা-বিদ্যায়**—গঙ্গাধর সেন, দ্বারকানাথ সেন, গুডিভ্ চক্রবর্ত্তী, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল দত্ত, সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, কেদার দাস, নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, বামনদাস মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, গণনাথ সেন, নলিনীরঞ্জন সেন, কুমুদশঙ্কর রায়।

(১০) **ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে**—রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামী প্রণবানন্দ।

(১১) **শিক্ষা-প্রসারে**—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বসু, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহম্মদ মহসীন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আজিজুল হক, হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু, অমিয় চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

(১২) **নারীমুক্তি আন্দোলন ও স্ত্রী-শিক্ষা-প্রসারে**—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণ-

ভামিনী দাস, কালীকৃষ্ণ দেব, অবলা বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুসদয় দত্ত, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, সরলা দেবীচৌধুরানী, সরলাবালা সরকার, সারদেশ্বরী দেবী।

(১৩) **ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে**—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দীনেশচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালিদাস নাগ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ক্ষিতিমোহন সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহেন্দ্রনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(১৪) **সাংবাদিকতায়**—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, রামমোহন রায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণবিহারী সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণদাস পাল, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, যদুনাথ মজুমদার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীনাথ রায়, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার, হেমচন্দ্র নাগ, সজনীকান্ত দাস, অমল হোম।

আইন ব্যবসায়ে--রাসবিহারী ঘোষ, আবদার রহিম, তারক পালিত, চিত্তরঞ্জন দাশ, সৈয়দ আমির আলি, রমেশচন্দ্র মিত্র, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শশিভূষণ দে, রাধাবিনোদ পাল, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১৬) **খেলাধূলায়**—সারদারঞ্জন রায়, দুখীরাম বাবু, এস্. ব্যানার্জ্জী (ক্রিকেট)। শিবদাস ও বিজয়দাস ভাদুড়ী, অভিলাষ ঘোষ, গোষ্ঠ পাল, মনা দত্ত, সামাদ, আব্বাস, (ফুটবল)। প্রফুল্লকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সাঁতার)। শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশানন্দ ঢেঁকী, যতীন্দ্রমোহন গুহ বা গোবরবাবু, কাপ্তেন পি. কে. গুপ্ত (শক্তি চর্চ্চা)। বিষ্ণু ঘোষ (ব্যায়াম)। এস. কে. মুখার্জ্জী, দিলীপ বসু (টেনিস)। অমর দত্ত

(ভার তোলা)। প্রত্যূষ দেব (বিলিয়ার্ড খেলা)। পরেশলাল রায়, বলাই চট্টোপাধ্যায়, জগৎকান্তি শীল, রবীন সরকার (মুষ্টিযুদ্ধ)।

(১৭) **দানব্রতে**—মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, রাণী কাত্যায়নী, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, রাজেন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দলাল রায়, মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী, চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজা সুবোধ মল্লিক, শশিভূষণ দে, ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(১৮) **নাটক অভিনয়ে**—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমৃতলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশিরকুমার ভাতুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

বাঙালী কি 'যুদ্ধ-অপারগ' জাতি ?

না! সে কথা সত্য নয়, 'তোমরা যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পড়ো, জানতে পারবে যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যখন আর্য্যরা সভ্যতা বিস্তার কল্লে বিভিন্ন রাষ্ট্র জয় ক'রে দিকে দিকে এগিয়ে চলেছিল, তখন তারা সব প্রথম বাধা পায় বাঙালীদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে। আর্য্যদের কাছে তাঁরা মাথা নোয়াননি প্রথমে। তারপরে যখন মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত সারা আর্য্যাবর্ত্তে রাজ্যবিস্তার করেন, তখন তিনিও প্রাচীন বাঙলার 'গঙ্গারিডি' বা 'গঙ্গারাঢ়' রাষ্ট্রকে বড় সহজে পদানত করতে পারেননি। তারপর বাঙলা দেশ যখন 'গৌড়বঙ্গ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে—তখন গৌড়েশ্বর, মুসলমান রাজা শামসুদ্দীন ইলিয়াসের সঙ্গে দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ শাহ তোগলকের ভয়ানক যুদ্ধ বাধে—এই যুদ্ধ 'একডালার যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এই যুদ্ধে সহদেব নামে একজন বাঙালী সেনাপতি একলক্ষ আশি হাজার বাঙালী সৈন্য নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। বাঙালীর বীরত্বেই সেবার ফিরোজ শাহ তোগলককে যুদ্ধ জয়ে বিফলমনোরথ হয়ে দিল্লী ফিরে যেতে হয়—এবং ১৩৫৭ খ্রীঃ অব্দে দু'দলে সন্ধি হয়—তখন থেকেই বাঙলার

স্বাধীনতা দিল্লীর বাদশাহকে মেনে নিতে হয়। একালে ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে ইউরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে যখন, তখন বাঙালীকে এই যুদ্ধের সৈনিক ক'রে নেওয়া হয়। বাঙালীকে যুদ্ধে যোগ দেবার অধিকার দেন সর্ব প্রথম ফরাসী ভারতের কর্তৃপক্ষ। ফ্রান্সের সহায়তায় ২৫জন বাঙালী যুবক এই যুদ্ধে যোদ্ধার সম্মান লাভে এগিয়ে যান, মৃত্যুকে ভয় না ক'রে ফ্রান্সের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালীর ছেলেরা প্রথম প্রমাণ ক'রে আসে যে, বাঙালী যুদ্ধ-অপারগ জাতি নয়। বীর বাঙালী যুবক যোগীন্দ্রনাথ সেন ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দের ২২শে মে। ইনিই প্রথম বাঙালী যিনি ইউরোপের মহাযুদ্ধে সাধারণ সৈনিক হয়ে মরণ বরণ ক'রে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন। গত মহাযুদ্ধে দুই হাজার বাঙালী সৈনিক নিয়ে গঠিত 49th Regiment মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে এসেছে। এ সব জানা সত্ত্বেও বাঙালীকে 'যুদ্ধ-অপারগ' জাতি ব'লে যারা অপবাদ দিত তারা বাঙালীকে ভয় করতো, এই কথাটাই জেনে রেখো। বর্ত্তমান যুদ্ধে বাঙালীর ছেলে বৈমানিক ইন্দ্রনাথ রায়, কালীপ্রসাদ চৌধুরী, ও আরও অনেকে প্রাণ দিয়ে বাঙালীর গৌরব বাড়িয়ে গেছেন। এছাড়া স্বাধীন ভারতের সৈন্যবাহিনীর পরিচালনায় মেজর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী, এয়ার ভাইস মার্শ্যাল সুব্রত মুখার্জ্জী ও মেজর জেনারেল অজিত অনিল রুদ্র, কাশ্মীর যুদ্ধে রঞ্জন দত্ত প্রভৃতি বাঙালীর গৌরব বাড়িয়েছেন।

বাঙালীর সেরা 'সাহিত্য-সৃষ্টি' বলতে মোটামুটি কোন্ কোন্ রচনা বা গ্রন্থ বোঝায়?

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির—'পদাবলী'; কাশীরাম দাসের—'মহাভারত'; কৃত্তিবাসের—'রামায়ণ'; মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর—'চণ্ডীমঙ্গল'; কৃষ্ণদাস কবিরাজের—'চৈতন্য চরিতামৃত'; ভারতচন্দ্র রায়ের—'অন্নদা মঙ্গল'; মাইকেল মধুসূদন দত্তের—'মেঘনাদ বধ'; নবীনচন্দ্র সেনের—'প্রভাস', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রৈবতক,' ,কুরুক্ষেত্র'; দীনবন্ধু মিত্রের—'নীলদর্পণ'; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

—কমলাকান্তের দপ্তর', 'কপালকুণ্ডলা,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'আনন্দমঠ'; রমেশচন্দ্র দত্তের—'জীবনসন্ধ্যা', 'জীবনপ্রভাত'; অক্ষয়কুমার বড়ালের—'এষা,'; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের—'গীতাঞ্জলি'; 'গল্পগুচ্ছ', 'গোরা'; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'বৃত্রসংহার'; স্বামী বিবেকানন্দের—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'কর্ম্মযোগ' 'জ্ঞানযোগ', 'পত্রাবলী,' 'ভাববার কথা'; তারকনাথ গাঙ্গুলীর—'স্বর্ণলতা'; মশর্‌রফ্ হোসেনের—'বিষাদসিন্ধু'; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের —'চন্দ্রগুপ্ত', 'হাসির গান', 'মেবার পতন'; গিরিশচন্দ্র ঘোষের—'বলিদান', 'অশোক', 'প্রফুল্ল'; ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের—'রঘুবীর', 'আলমগীর' 'নিবেদিতা'; অমৃতলাল বসুর—'বিবাহ-বিভ্রাট', 'খাস-দখল'; জলধর সেনের —'হিমালয়'; রাধারাণী দেবীর—'লীলাকমল'; কামিনী রায়ের—'আলো ও ছায়া'; অনুরূপা দেবীর—'মা', 'পোষ্যপুত্র'; নজরুল ইস্‌লামের—'অগ্নিবীণা'; অরবিন্দ ঘোষের—'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা'; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের—'শ্রীকান্ত', 'শেষপ্রশ্ন', 'পথের দাবী'; প্রমথ চৌধুরীর—'চার ইয়ারী কথা,' 'বীরবলের হালখাতা'; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের—'বেণু ও বীণা', 'কুহু ও কেকা', 'তীর্থরেণু'; শচীন সেনগুপ্তের—'গৈরিকপতাকা'; অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের—'কর্ণার্জ্জুন'; মন্মথ রায়ের—'কারাগার', 'মীরকাসিম'; সুবোধ ঘোষের—'ফসিল', 'পরশু-রামের কুঠার'; নিরুপমা দেবীর—'শ্যামলী,' 'দেবত্র,'; যাযাবরের—'দৃষ্টিপাত'; মৌমাছির—'নয়াযুগের রূপকথা', 'পুতুলের দেশ', 'যারা মানুষ নয়'; অন্নদাশঙ্কর রায়ের—'পথে-প্রবাসে'; রবীন্দ্র মৈত্রের—'ত্রিলোচন কবিরাজ' ও 'থার্ড ক্লাস'; কান্তিচন্দ্র ঘোষের—'ওমর-খৈয়াম'; কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'কবুলতি', 'আমরা কি ও কে?'; দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের—'ঠাকুরমার ঝুলি'; সুকুমার রায়-চৌধুরীর—'আবোল্‌তাবোল', 'হযবরল'; যোগীন্দ্রনাথ সরকারের—'হিজিবিজি', 'হাসিখুসি,' খুকুমণির ছড়া'; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের —'রাজকাহিনী'; 'বুড়ো আংলা', 'নালক'; যামিনীকান্ত সোমের—'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ'; পরশুরামের—'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী'; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

—'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ; শ্রীম কথিত—'রামকৃষ্ণ কথামৃত' ; প্রবোধ সান্যালের—'মহাপ্রস্থানের পথে' ; সজনীকান্ত দাসের—'পথ চলতে ঘাসের ফুল' ; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের—'ধাত্রী দেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' ; 'বনফুলের'—'শ্রীমধুসূদন', 'জঙ্গম' ; সতীনাথ ভাদুড়ীর—'জাগরী' ; সৈয়দ মুজতবা আলীর—'দেশেবিদেশে'।

বাঙলাকে আরও ভাল ক'রে জানতে হলে বড় হয়ে কি কি বাঙলা বই পড়তে হবে ?

(১) বাঙলার ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বৃহৎ বঙ্গ—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন। (৩) বাঙালীর বল—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য। (৪) আমরা বাঙালী—হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়। (৫) গৌড়ের ইতিহাস—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। (৬) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন। (৭) বাঙলা ও বাঙালী—রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। (৮) মধ্যযুগের বাঙলা—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। (৯) ফিরিঙ্গী বণিক—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। (১০) বঙ্গের ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী। (১১) পুরাতনী—হরিহর শেঠ। (১২) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস।

তুমি ও তোমার শরীর

ঘুম পায় কেন ?

এ সম্বন্ধে বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিক বলেন মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের রকমফের হওয়ার ফলেই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, আর জেগে ওঠে। যখন আমরা জেগে থাকি তখন স্নায়ুকেন্দ্রগুলি রক্তকোষগুলিকে অনবরত খাটিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা এই ভাবে মানুষের জাগা অবস্থায় কাজ করতে করতে স্নায়ুকেন্দ্রগুলিও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজেই রক্তকোষগুলিও কাজে

ঢিলে দেয়, তখন রক্ত চলাচলের বেগটা কমে আসে, ফলে মস্তিষ্কের কাজ করার ক্ষমতাও কমে আসে, তখনই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। আবার যখন বিশ্রাম নেবার পর স্নায়ুকেন্দ্রগুলো কাজে লাগে, মানুষ তখনই জেগে ওঠে।

তৃষ্ণা পায় কেন?

জেনে রাখো, আমাদের প্রত্যেকের শরীরে 'নিউমো গ্যাসট্রিক' (Pneumo Gastric) ব'লে যে স্নায়ুশ্রেণী আছে সেই স্নায়ুশ্রেণীই পাকস্থলীতে 'কামনার' উদ্রেক করে। যখন শরীরের ভেতরকার প্রয়োজনমত জল কম পড়ে, তখন ঐ স্নায়ুশ্রেণীই মস্তিষ্কের অনুভূতিকেন্দ্রে জানিয়ে দেয় যে 'শরীরে জলের প্রয়োজন'। সঙ্গে সঙ্গে পান করার কামনা বা ইচ্ছা জেগে ওঠে আমাদের মনে—একেই বলি আমরা তৃষ্ণাবোধ।

হাই ওঠে কেন?

হাই ওঠার ব্যাপারটা ঘটে এইজন্যে যে, যখন আমাদের ক্লান্তি বোধ হয়, বা ঘুম পায় তখনই রক্তে অক্সিজেনের অভাব ঘটে, তখন নাক দিয়ে যে অক্সিজেনটুকু ফুস্‌ফুসে যায়, তাতে সে অভাবটা মেটে না, তাই হাই উঠে মুখের গর্ত্ত দিয়ে খানিকটা বাতাস গিয়ে সেই অক্সিজেনের অভাবটুকু খানিকটা মেটায়।

নাক ডাকে কেন?

ঘুমোবার সময় আমাদের শোবার দোষে অনেক সময় আমাদের স্বর-নালীটি স্বাভাবিক অবস্থায় না থেকে বেকায়দায় পড়ে বেঁকে-টেরে যায়। তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে, তার ফলে স্বরনালীটি থেকে বেয়াড়া শব্দ বেরোয়, নাক বা মুখ দিয়ে। অনেকের স্বরনালীটিতে এমন কোন গলদ সব সময়েই থাকে যে জন্য ঘুমোলেই তাদের নাক ডাকে।

মাথার চুলে তেল দিলে বাড়ে, অথচ চোখের পাতার চুলে তেল দিলে বাড়ে না, এর কারণ কি?

কারণটা আর কিছু নয়, আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ কতকগুলি

cell বা কোষের সমষ্টি ; কিন্তু বিভিন্ন অংশের ঐ cellগুলি বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। মাথার চুল যে অংশে জন্মায় সেখানের cellগুলি যেভাবে কাজ করে ঠিক সেই ধরণের কাজ চোখের পাতার cellগুলি করে না, কাজেই মাথার চুল যে পরিমাণে বাড়ে চোখের পাতার চুল সে পরিমাণে বাড়ে না এবং সর্ব্বত্র চুলের গোড়ায় যে সমস্ত সেল থাকে তার সমষ্টিগত শক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকটি চুলের বাড়বার সীমা আছে, সেই সীমার বেশী কেউ বাড়তে পারে না।

পাকা চুল সাদা দেখায় কেন?

পাকা চুল সাদা দেখায় তাতে পিগ্‌মেণ্ট (pigment) ব'লে পদার্থ টির অভাব ঘটে। এই পিগ্‌মেণ্ট হচ্ছে এক রকম রক্ত-জাতীয় জিনিস।

বুকটা ধুক্‌ধুক্ করে কেন?

তার কারণ বুকের মধ্যেই আছে দেহের আসল যন্ত্র হৃৎপিণ্ড বা 'হার্ট'। জীবন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এই যন্ত্রটি চলতে সুরু করে—চলে মৃত্যু পর্য্যন্ত। এইটি বন্ধ হলেই দেহের সব কলকব্জা অচল হয়ে পড়ে।

শীতকালে গা, হাত, পা, ঠোঁট ফাটে কেন?

এর কারণ শীতকালের আবহাওয়াতে জলীয় অংশ বা moisture খুব কম থাকে ; তাই সব জিনিস থেকে সেই আবহাওয়া জল শুষে নিতে চায়, আমাদের চামড়া, ঠোঁট, হাত, পা থেকেও আবহাওয়া তখন তেল ও জল টেনে নেয়, ওগুলো তখন শুকিয়ে যায় বেশী রকম, তাই তা ফাটে। সেইজন্য শীতকালে গা, হাত, পা ও ঠোঁটে বেশি তেল দেবার ব্যবস্থাটা ভাল। তেল দিলে চামড়া নরম হয় ও সহজে ফাটে না।

কাতুকুতু দিলে হাসি পায় কেন?

আমাদের হাসির উৎপত্তি হয় প্রধানতঃ তিনটী বিভিন্ন শ্রেণীর পেশীর

(muscle) নড়াচড়ার ফলে। মুখের কতকগুলি পেশী ও শ্বাসযন্ত্রের পেশী সজাগ হয়ে ওঠে—সাধারণতঃ যখন আমরা মস্তিষ্কে কোন আনন্দদায়ক অনুভূতি পাই। কিন্তু এ ছাড়াও জোর ক'রে ঐ মাংস-পেশীগুলিকে সজাগ ক'রে মানুষকে হাসানো যায়, যদি ঐ পেশীগুলির সঙ্গে শরীরের অন্য অংশের যে সমস্ত পেশীর (muscle) যোগ আছে, সেগুলিকে নাড়া দেওয়া যায়। কাতুকুতু দেওয়ার ফলে ঠিক এই পেশীগুলোকে নাড়া দেওয়ার ব্যাপারটাই ঘটে, তাই আমরা না হেসে পারি না।

সর্দ্দি হয় কেন ?

অনেক সময় নাকে শুকনো ঘাস, পাতার গুঁড়ো, ফুলের রেণু বা ধূলিকণা যায়। তখন নাকের Muccous Membrane বা শ্লেষ্মাপট ব'লে অংশটি উত্তেজিত হয়ে নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি জাগায়, ফলে হাঁচির সঙ্গে সর্দ্দি দেখা দেয়। অনেক সময় ঠাণ্ডা ভিজে কাপড় গায়ে থাকলে বা গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে সর্দ্দি হয়। এর কারণ ঐ ভাবে ঠাণ্ডা লাগার ফলে চামড়ার নীচের 'রক্তথলি' বা Blood vesselsগুলো সঙ্কুচিত হয়ে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটায়। রক্তপ্রবাহই আমাদের শরীরে প্রয়োজনমত উত্তাপ বজায় রাখে, কাজেই তখন শরীরের স্থায়ী উত্তাপটা কমে আসে এবং রক্তপ্রবাহ শরীরের কোন কোন জায়গায় এসে জমে যায়, বিশেষ ক'রে নাকের ভিতর এবং গলার চামড়ার তলায় রক্তটা বেশী জমে যায়। তখন বাতাসে ভেসে আসা রোগ-বীজাণুগুলো নাকে ঢুকে এই জমাট বাঁধা রক্ত থেকে খাবার পেয়ে চট্‌পট বেড়ে ওঠে—ফলে সর্দ্দি রোগটি দেখা দেয়।

জ্বর হলে 'জ্বরঠোঁট' হয় বা ঠোঁটে ফোস্কা পড়ে কেন ?

জ্বর হলে জ্বর-ঠোঁট হয় বা ফোস্কা পড়ে এই জন্য যে শরীরের সামান্য উত্তাপে সহজেই সেটা গরম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ঠোঁটের চামড়ার ঠিক নীচেই যে সব রক্তথলি (Blood vessels) আছে তা জ্বরের সময় খুব সহজই গরম হয়ে ওঠে আর তাই ঠোঁটেই অমন ফোস্কা পড়ে।

চোখ নাচে কেন?

আমরা সচরাচর যে ব্যাপারটাকে 'চোখ-নাচা' বলি সেটা আসলে চোখের নাচই নয়। চোখের বাইরে চোখের পাতা বা যে আবরণ আছে, তারই কতকগুলি মাংসপেশী (Muscles) রক্ত চলাচলের গোলমালে ও আরও নানা কারণে ঐভাবে কাঁপতে শুরু করে। সেই মাংসপেশীগুলির স্পন্দনকেই আমরা ভুল ক'রে বলি, 'চোখ নাচা'।

জুতোর ঘষাঘষি লেগে বা পুড়ে গেলে চামড়ায় ফোস্কা পড়ে কেন?

এর একমাত্র কারণ উত্তাপ—জুতার ঘষটানিতে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়, আর আগুনে যে উত্তাপ থাকে, সে কথাতো জানই; এখন উত্তাপ শরীরের যে জায়গাটিতে লাগে—সেই জায়গাটির জলীয় অংশ ও রক্ত, উত্তাপে জলীয় বাষ্প হয়ে জড়ো হয় ঐ জায়গাটিতে। কিন্তু সেই বাষ্প চামড়া ভেদ ক'রে বেরুতে পারে না বলেই তার চাপে চামড়াটি যায় বেড়ে—তারই মধ্যে আশ্রয় নেয় ঐ বাষ্প। সেটাকেই তো আমরা 'ফোস্কা' বলে থাকি।

বিছুটি গায়ে লাগলে কুটকুট করে কেন?

তার কারণ বিছুটি গাছের পাতায় দেখবে খুব সরু সরু রোঁয়া আছে। এই রোঁয়াগুলো যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখে দেখ, দেখবে ঐ রোঁয়াগুলোর ডগার ওপরটা বলের মত গোল, কিন্তু আমাদের গায়ে লাগার সঙ্গে ঐ গোল ডগাটা ভেঙে গিয়ে আমাদের চামড়ার ভেতর রোঁয়ার ছুঁচ্‌লো ডগাটা যায় ঢুকে। আর ঐ রোঁয়ার ভেতরের ফাঁপা নলে যে বিষাক্ত রস থাকে, সেই রস তখন রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত জায়গাটি ফুলে ওঠে ও কুটকুট করে।

ভয় পেলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে কেন?

কারণ আমাদের গায়ের প্রত্যেকটি লোম বা চুলের গোড়াটার চারিধারে একটা ক'রে খাপের মত জিনিস থাকে, একে বলা হয় লোমকূপ বা Follicle,

এই Follicle'এর সঙ্গেই থাকে প্রথমতঃ রক্তথলি (Blood vessels) অর্থাৎ যেখানে রক্ত থেকে প্রতিটি চুল তার খাদ্য সংগ্রহ করে ; দ্বিতীয়তঃ থাকে কতকগুলি গ্রন্থি বা Glands, এগুলোর কাজ হলো চুলকে নরম আর তেলা ক'রে রাখা। আর থাকে ঐ রক্তের থলির সঙ্গে সংযুক্ত কতকগুলো স্নায়ু (Nerves) ও পেশী (Muscles)। লোমের নীচের এই পেশীগুলিকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'ইরেকটর প্যাপিলে' (Erector papillae), তোমরা বলতে পার 'চুল খাড়া করার পেশী'—পেশীগুলির সঙ্গে স্নায়ুর যোগাযোগ আছে। যখন আমরা ভয় পাই তখন আমাদের মস্তিষ্ক ও দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলোর সঙ্গে লোমকূপের স্নায়ুগুলোও সজাগ হয়ে ওঠে, ফলে ঐ লোম খাড়া করবার পেশীগুলিও সঙ্কুচিত হয়। তাই ভয় পেলে লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ঘুরলে মাথা ঘোরে এবং সব জিনিস ঘরছে বলে মনে হয় কেন ?

যখন তুমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একই কেন্দ্রে ঘুরপাক খাও, তখন তোমার চোখের সামনে যা কিছু থাকে, সবগুলির ছায়া খুব তাড়াতাড়ি তোমার চোখের দৃষ্টিতে অনবরতই বদলে যায় ; চোখের দৃষ্টিতে তাই সেগুলিকে তখন সচল বলেই মনে হয়। এই সচল গতির অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোও অস্বাভাবিক ভাবে সচল হয়ে ওঠে। তাই তুমি যখন স্থির হয়ে দাঁড়াও তখন মস্তিষ্কের ঐ সচল অনুভূতিটা—দেখার অনুভূতির চেয়ে প্রবল হয়ে থাকে, অর্থাৎ চোখে যদিও তখন আশপাশের জিনিসগুলির মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, তবুও মস্তিষ্ক সেটা অনুভব করতে পারে না। তাই তখনও মনে হয় আশে পাশের জিনিসগুলো ঘুরছে, আর মাথাটাও ঘুরছে।

অন্ধকারে দেখতে পাই না কেন ?

ক্যামেরার লেন্স দিয়ে যেমন ক্যামেরার পেছনে ঘষা কাচটিতে ছবি

প্রতিফলিত হয় তেমনি আমাদের চোখের মণির ভেতর দিয়ে তার পেছনে, চোখের ভেতর যে পাতলা পর্দা ('অক্ষিপট' বা Retina) আছে, তাইতে আমরা যা কিছু দেখি সেই ছবিটি প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলন আলোর সাহায্যে সম্ভব—তাই অন্ধকার জায়গায় কোন জিনিস রেখে যদি ফোকাস করা যায়, তাহলে পেছনের ঘষা কাচে ছবি প্রতিফলিত হয় না। যে জিনিসটি আমরা দেখি তার ওপর আলো প'ড়ে সেটি আবার চোখের মণির ভেতর দিয়ে অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয় বলেই মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে উত্তেজনা জাগায়, তাই আমরা দেখতে পাই—কাজেই যেখানে আলো নেই, সেখানে কোন জিনিস থাকলে তার প্রতিফলন অক্ষিপটে হয় না, তাই আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই না।

অন্ধকার কেন ঘুমের সাহায্য করে?

এর কারণ হচ্ছে তোমরা জানো, আলো থেকে গাছপালা, পশুপাখী আমরা সবাই অল্পবিস্তর জীবনীশক্তি পেয়ে থাকি, অর্থাৎ আলো আমাদের স্নায়ু ও মস্তিষ্কে চাঞ্চল্য এনে জড়তা দূর করে। আচ্ছা এখন জেনে রাখ যে, যখন ঘুম পায়, তখন আমাদের স্নায়ু, মস্তিষ্ক ও পেশীগুলো সব খেটে খেটে এলিয়ে পড়ে, তারা চায় বিশ্রাম; কিন্তু তখন যদি আমরা আলো জ্বালিয়ে রাখি সেই আলোর পরশে তখনও ঐ ক্লান্ত স্নায়ুগুলো এলিয়ে পড়া সত্বেও সজাগ হয়ে ওঠে, তারা ছুটি নিতে পারে না অতটা তাড়াতাড়ি, অর্থাৎ ঘুমটা একটু দেরীতেই আসে, কিন্তু আলো না থাকলে তাদের এই চেতনাটা সহজেই কমে আসে, সহজেই তারা শান্ত হয়ে পড়ে, আর আমরাও চটপট ঘুমিয়ে পড়ি।

টক খেলে দাঁত টকে যায় ও গা শির্ শির্ করে ওঠে কেন?

আমাদের দাঁতের ওপরে যে 'কলাই' বা 'এনামেলে'র আবরণ আছে, তাতে টক জিনিসের 'এ্যাসিড' লাগে আর তারই রাসায়নিক ক্রিয়ায় সাময়িক-

ভাবে ঐ এনামেলটা তখন জখম হয়ে পড়ে, ফলে দাঁতের ঐ 'কলাই' বা সাদা পাথরের মত অংশের নীচে যে সব স্নায়ু আছে, সেগুলো সজাগ হয়ে ওঠে। তাই দাঁত টকে যায় ও তার শিহরণ লেগে দেহের স্নায়ুমণ্ডলীও শির্ শির্ ক'রে ওঠে।

নখ ও চুল কাটতে ব্যথা লাগে না কেন ?

নখ ও চুলের সঙ্গে কোনও নার্ভ বা স্নায়ুর যোগাযোগ নেই ব'লে। স্নায়ুর মারফতেই আমরা সব রকম ব্যথা অনুভব করি, তাই নখ চুল কাটলে আমাদের ব্যথা লাগে না।

ভাল ভাল খাবার দেখলে জিভে জল আসে কেন ?

খাবার দেখলে জিভ থেকে যে জল বেরোয়, সেটা ঠিক জল নয়, আসলে ওটা লালা। আমাদের মুখের ভেতর জিভের নীচে ও গালের ভেতরের দেওয়ালে লালা-গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি বা গ্লাণ্ডগুলো রক্ত থেকে জল ও অন্যান্য পদার্থ বার ক'রে নিয়ে লালা তৈরী করে এবং লালার আকারে তা ই ঐ লালা-গ্রন্থির সঙ্গে সংযুক্ত সূক্ষ্ম নল বেয়ে আমাদের মুখে এসে পৌঁছায়। এই লালা জিনিসটা সব সময়ে আমাদের মুখের ভেতরটিকে ভিজিয়ে রাখে, তাছাড়া যখন আমরা কোন কিছু খাই তখন এই লালা খাবার জিনিসকে ভিজিয়ে নরম ক'রে দেয় ও খাবার চিবানো এবং খাবার গেলার ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে তোলে। খাবার মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জিভের স্বাদ-গ্রন্থির স্নায়ু মারফৎ মস্তিস্কে খবরটা পৌঁছে যায়, অমনি সেখান থেকে অপর স্নায়ুর মারফৎ লালা-গ্রন্থিগুলোতে উত্তেজনা জেগে ওঠে—ফলে লালা বেরোতে সুরু করে। সময় সময় খুব ভাল ভাল খাবার দেখলে নাক চোখও রীতিমত তার খবরটা তাদের স্নায়ু মারফৎ পৌঁছে দেয় মস্তিষ্কে—মস্তিষ্ক তখন আগের মতই লালা-গ্রন্থিগুলোকে জাগিয়ে তোলে। তাই রুচিকর খাবার দেখলে বা খাবারের গন্ধ পেলে আগে থেকেই আমাদের জিভে জল দেখা দেয়।

দু'টি চোখ দিয়ে আমরা একই জিনিসকে দুটো ক'রে দেখি না কেন? একটা চোখের ওপরটা টীপে ধরলে দুটো ক'রে দেখি কেন?

কারণ সাধারণতঃ দুটো চোখই এমন ভাবে তৈরী যে তারা একসঙ্গে একই ভাবে তাদের আলোক প্রতিফলনের কাজ করে এবং মস্তিষ্কের একই কেন্দ্রে এই দৃষ্টিবোধের চেতনা জাগায়। তবে দুটো চোখ যদি একই ভাবে না থেকে একটু ওলোট-পালোট হয়ে যায় তা হলে আলোক প্রতিফলনের ব্যাপারেও গরমিল ঘটে। তখন আমরা একই জিনিসকে দুটো তিনটে দেখি—এটাই হলো চোখের গোলমাল; চোখ ট্যারা করলে বা একটা চোখের ওপরটা টিপে ধরলে তাই এ ব্যাপারটা ঘটে।

ধূলো-বালি পড়লে বা পেঁয়াজ কাটবার সময় চোখ দিয়ে জল পড়ে কেন?

এর কারণ হচ্ছে, যত বারই আমরা চোখের পাতা ফেলি, ততবারই আমাদের চোখের কোণে যে অশ্রুগ্রন্থি বা Lachrymal Gland আছে, তা থেকে জল বেরিয়ে আমাদের চোখের গোলকটাকে বা Eye ballটাকে, অনবরতই ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে দিচ্চে এবং সেই জল একটা নালা দিয়ে নাকের মধ্যে চলে গিয়ে শ্লেষ্মার সৃষ্টি ক'রছে; অর্থাৎ আমাদের চোখের গোলকটার ওপর সব সময়েই জল রয়েছে, তবে সেটা আমরা লক্ষ্য করি ন', কাজেই, যখন ঠাণ্ডা বাতাস, ধূলো ময়লা বা অন্য কিছু আমাদের চোখের কাজে বাধা দেয় তখনই ঐ গ্লাণ্ড থেকে খুব বেশী জল বেরিয়ে চোখটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে এবং তখন জল এতো বেশী পরিমাণে বেরোয় যে চোখের ঐ নালা ভর্ত্তি হয়ে উপ্‌ছে পড়ে আমাদের গালের উপর। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে, যখন আমরা পেঁয়াজ ছাড়াই। পেঁয়াজে এক রকম সাদা ঝাঁঝাঁলো তেল আছে, যা বাতাসে উড়ে যায় বা উবে যায়। কাজেই পেঁয়াজ ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ঝাঁঝাঁলো তেলের খুব ছোট ছোট কণা বাতাসে ভেসে এসে

আমাদের চোখের গোলকটাতে লাগে আর জ্বালার সৃষ্টি করে,—তাই অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঐ অশ্রুগ্রন্থি থেকে হুড় হুড় ক'রে জল বেরিয়ে আসে চোখের ঐ গোলকটাকে ঝাঁঝাঁলো তেলের হাত থেকে রক্ষা করতে।

কয়লার ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে কেন?

কয়লার ধোঁয়াতে সাধারণতঃ থাকে জলীয় বাষ্প, কার্ব্বন ডায়ক্সাইড এবং সালফার ডায়ক্সাইড গ্যাস—ঐ সালফার ডায়ক্সাইড ও কার্ব্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাস চোখের জলের সঙ্গে মিশে কার্ব্বনিক এসিড ও সালফিউরিক এসিডের সৃষ্টি করে এবং এসিডের ক্ষারের সংস্পর্শে এসে চোখের স্নায়ুগুলো আঘাত পায়, তাই ধোঁয়া লাগলে চোখ জ্বালা করে। যে সব জিনিসের ধোঁয়ায় এগুলি বর্ত্তমান থাকে না, তাতে চোখ জ্বালা করে না।

হাতে পায়ে ঝিন্ ঝিন্ ধরে কেন?

আমাদের দেহে এমন কতকগুলো স্নায়ু আছে, যাদের সাহায্যে আমরা কোনও জিনিস ছুঁলেই টের পাই যে, "ছুঁয়েছি"।—একে বলা হয় 'স্পর্শানুভূতি'। এই 'স্পর্শানুভূতি'টা আসলে হয় আমাদের মস্তিষ্কে—এই স্নায়ুগুলোর মারফত। এখন—সময় সময় বেকায়দায় পড়ার ফলে, বা চাপ লেগে হাত পায়ের ওই ধরণের স্নায়ুগুলোর কাজ বন্ধ হয়ে যায়, কাজেই মস্তিষ্কে সেই স্পর্শানুভূতিটা নিয়ে যেতে পারে না ভাল ক'রে। তখনই মনে হয় হাতপায়ের ও-জায়গাটা অসাড় হয়ে গেছে, মনে হয় ঝিন্ ঝিন্ করছে। স্নায়ুগুলো তাদের কাজ করতে না পেরে ছট্ফট্ করে ব'লে ওই ঝিন্ ঝিন্ ধরার ব্যাপারটা ঘটে। অর্থাৎ ঝিন্ ঝিন্ ধরে—স্নায়ুর আক্ষেপের ফলেই।

শোক, দুঃখ বা আঘাত পেলে মানুষ কাঁদে কেন?

শোক, দুঃখ, আনন্দ বা আঘাত পেলে মানুষের মস্তিষ্কের কতকগুলি তারে (স্নায়ুতে) কাঁপন লাগে এবং সেই কাঁপনের ঢেউ এসে লাগে চোখের অশ্রু-গ্রন্থিতে (Tear Gland); তখনই ঐ টিয়ার গ্লাণ্ড বা অশ্রু-গ্রন্থি থেকে হুড় হুড় ক'রে জল বেরিয়ে পড়ে। এই জল ঐ গ্লাণ্ডগুলোর সাহায্যে আমাদের

শরীরের রক্ত থেকেই সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয় এবং এই ভাবে চোখ দিয়ে জল বার হওয়ার ব্যাপারটাকেই 'কান্না' বলা হয়।

দুটো কানে আঙুল দিয়ে চেপে বন্ধ করে দিলে কানের ভেতরে এক রকম গুর্ গুর্ শব্দ শোনা যায় এর কারণ কি?

এর কারণ সহজ ক'রে বুঝতে হলে, বুঝতে হবে প্রথম শব্দটা কি ক'রে আমরা শুনতে পাই। কানের বাইরের দিকের গর্ত্ত দিয়ে শব্দতরঙ্গ ঢুকে ধাক্কা দেয় কানের Eardrum-এর ওপর, এর 'পরে শব্দঢেউ লেগে সেটা কাঁপতে থাকে এবং সেখানকার স্নায়ুমণ্ডলী মারফৎ সেটা মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছায় এবং Eardrum-এর বাইরের দিকে যেমন কানের গর্ত্ত বা নল আছে (অর্থাৎ যেটাতে আমরা কলম বা পেন্সিল ঢুকিয়ে কানের ময়লা বার করি) ঠিক তেমনি ধারা আর একটা নল আছে কানের পর্দ্দার পেছন থেকে গলার ভেতর অবধি। এই নলটিকে বলা হয় Eustachian Tube (অষ্টাচিয়ান নল)। এই নলটিতে সব সময়েই বায়ু ভর্ত্তি থাকে—এই জন্য যে কানের পর্দ্দাটা বাইরের হাওয়ার চাপে যেন একপেশে না হয়ে পড়ে অর্থাৎ দু'পাশের বায়ুর চাপে সেটা ঠিক মাঝামাঝি জায়গাতেও দাঁড়িয়ে থাকে শব্দের কাঁপন ধরবার জন্যে। কাজেই যখন আমরা বাইরের দিকের কানের গর্ত্তটা আঙুল দিয়ে চেপে বন্ধ ক'রে দিই, তখন ঐ ভেতরকার নলের বায়ুর চাপে কানের পর্দ্দাটা কাঁপতে থাকে—এবং সেই কাঁপনের ফলে সেখানে একটা শব্দেরও সৃষ্টি হয়,—সেটাই শুনতে পাই তখন ঐ রকম 'গুর্ গুর্' আওয়াজের আকারে।

কানে 'খোল' হয় কেন? ঐ 'খোল' জিনিসট কি?

'খোল' পদার্থটি হচ্ছে কানের মল। কানের ভেতরের যে ছেঁদাটি দিয়ে শব্দ যায়—সেই ছেঁদাটি চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে, এই চামড়াতে কতকগুলি গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডস (Glands) আছে। এই গ্ল্যাণ্ড থেকে একরকম চট্‌চটে রস বেরোয়—তা' জমে জমেই কানে খোল জন্মায়। কানের ছিদ্রপথে রোগ-

বীজাণু ঢুকলে ঐ 'খোলের' আঠায় আটকে যায়—তাতেই কান রক্ষা পায়। তবে কানে 'খোল' খুব বেশী জমলে শব্দের গতিপথ বন্ধ হয়ে যায়—সেই জন্য মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা দরকার।

এক এক জন মানুষের গলার স্বর এক এক রকম হয় কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে যে, প্রত্যেক মানুষের স্বরনালী এবং যেখান থেকে গলার আওয়াজের উৎপত্তি, সেই সব তন্ত্রীগুলো সবাইকার সমান আকারের নয়। যাদের গলার আওয়াজ মোটা, তাদের স্বরতন্ত্রীগুলো (Vocal chord) বড় আর মোটা—যাদের গলার আওয়াজ মিহি তাদের স্বরতন্ত্রীগুলো ছোট এবং সরু। কাজেই এস্‌রাজের সরু বা মোটা তারে ঘা দিলে যেমন সরু বা মোটা আওয়াজ বেরোয়, তেমনি মানুষের স্বরনালী ও স্বরতন্ত্রীর গড়ন অনুযায়ী সরু মোটা আওয়াজ বেরোয়।

গলা ভাঙে কেন ?

মানুষের গলার ঐ স্বরতন্ত্রীগুলো বড় দুর্ব্বল—ঠাণ্ডা লাগা, সর্দ্দি কাশি হওয়া বা অতিরিক্ত চীৎকার প্রভৃতির ফলে ওগুলো অতি সহজেই সাময়িক-ভাবে অসাড়ত্ব পায়। স্বরতন্ত্রীর এই সাময়িক অসাড়ত্বই হ'ল স্বরভঙ্গ বা গলা ভাঙার কারণ। অনেক সময় 'ল্যারিংস' বা স্বরযন্ত্রটি ফুলে ওঠার ফলেও স্বরভঙ্গ ঘটে থাকে।

গরমকালে ঘাম হয়, শীতকালে ঘাম হয় না কেন ?

জবাবটা হচ্ছে এই যে, গরমকালে আমাদের শরীরের ভেতরকার উত্তাপটা ভয়ানক রকম বেড়ে যায়। কিন্তু এই উত্তাপ বাড়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। কাজেই তখন প্রকৃতির ব্যবস্থা অনুযায়ী চামড়ার তলায় রাশি রাশি রক্ত ছুটে যায় এবং ঐ রক্ত শরীরের উত্তাপে জল হয়ে চামড়ার সূক্ষ্ম ছেঁদা বা ঘর্ম্ম-গ্রন্থির (Sweat glands) ভেতর দিয়ে ঘাম হয়ে বাইরে আসে এবং বায়ুর সংস্পর্শে এসে এই জল হাওয়ায় উবে যায়। যখন ঐ

উবে যাওয়া ব্যাপারটা ঘটে—জল তার সঙ্গে খানিকটা উত্তাপ তখনই নিয়ে যায়, এইভাবে ঘাম বেরুনো ও সেটা উবে যাওয়ার ফলে শরীর তার বাড়তি উত্তাপটাকে কমিয়ে—উত্তাপটিকে ঠিক ক'রে নেয় তার দরকার মত। শীতকালে বাইরের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় শরীরের ভেতরটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডাই থাকে। কাজেই বাড়ন্ত উত্তাপ কমাবার জন্যে ঘামের তখন দরকারই হয় না। তাই আমরা শীতকালে ঘামি না।

বাসি খাবার খেলে চোঁয়া ঢেকুর ওঠে কেন ?

তার কারণ খাবার বাসি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে মিউকর (Mucor) ব'লে একরকম 'ছত্রক' জন্মায়—'ছত্রক' জিনিসটাকেই আমরা বলি 'ছাতা পড়েছে'। এই 'Mucor' পেটের মধ্যে গিয়ে, যে সমস্ত খাবার আমরা খেয়েছি সেগুলিকে তাড়াতাড়ি পচিয়ে তোলে। এই পচন-ক্রিয়াকে বলা হয় Fermentation। এরই ফলে পেটের ভেতর খুব বেশী কার্ব্বন ডায়ক্সাইড্ (Carbon Dioxide) গ্যাস উৎপন্ন হয়। সেই গ্যাস যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তাকেই আমরা বলি চোঁয়া-ঢেকুর।

যখন আমরা বেশী পরিশ্রম করি বা ব্যায়াম করি, তখন ঘাম হয় কেন ?

যখন আমরা বেশী পরিশ্রম বা ব্যায়াম করি, তখন আমাদের শরীরের উত্তাপ যোগায় যে খাদ্যগুলো, সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি পোড়ে বা হজম হয়ে যায়। ফলে আমাদের শরীরটি যতখানি গরম হওয়ার দরকার, তার চেয়ে বেশী গরম হয়ে ওঠে। কাজেই প্রকৃতির সুন্দর ব্যবস্থা অনুযায়ী চামড়ার নীচে বেশী পরিমাণে রক্ত ছুটে যায়। আগেই পড়েছ, শরীরের বাড়ন্ত উত্তাপ সঙ্গে সঙ্গে ঘামের সৃষ্টি করে। গায়ের চামড়ার অসংখ্য ছেঁদা দিয়ে ঘাম বেরিয়ে হাওয়ায় উবে যাওরার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিমাণে উত্তাপটাও সঙ্গে নিয়ে যায়, কারণ Evaporation বা উবে যাওয়ার ধর্ম্মই হ'ল উত্তাপ কমানো।

এইভাবে পরিশ্রম বা ব্যায়ামের ফলে যে বাড়ন্ত উত্তাপের সৃষ্টি হয়, ঘাম সেটাকে কমিয়ে শরীরের ভেতর ঠিক যতটুকু উত্তাপ দরকার মাপমতো ততটুকু উত্তাপেই বেঁধে শরীরকে স্বস্তি দেয়।

শীতকালে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোয় কেন ?

ব্যাপারটা হচ্ছে, নাক-মুখের ঐ ধোঁয়াটা জলীয় বাষ্প ছাড়া আর কিছুই নয়। শীতকালে বাইরের হাওয়ার উত্তাপটা মুখের ভেতরের উত্তাপটার চেয়ে ঠাণ্ডা থাকে ব'লে, ভেতরের জলীয় বাষ্প বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে খুব ছোট ছোট জলকণায় পরিণত হয়, আর সেটা ঐ ধোঁয়ার মত দেখায়। গরমকালেও মুখ দিয়ে ঐ রকম জলীয় বাষ্প বেরোয়, তবে বাইরের উত্তাপ তার চেয়ে বেশী থাকে বলেই সেটা তখন ওভাবে জলকণায় পরিণত হয় না, তাই তখন ঐ রকম মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে দেখা যায় না।

রক্ত লাল কেন ?

রক্তের তরল অংশকে বলা হয় প্লাজমা (Plasma), এই প্লাজমাতে লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট চাকৃতীর মতো এক রকম জিনিস ভেসে বেড়াচ্ছে—এগুলোকে বলা হয় রেড্ করপাসেল্‌স (Red Corpuscles) বা লাল-কণিকা—এগুলো আসলে কিন্তু লাল নয়; এগুলোর রং হচ্ছে ঘন হল্‌দে, তবে তারা অনেকগুলো এক সঙ্গে থাকার ফলেই মানুষের চোখে এই লাল রঙের আভাষ পাওয়া যায়। এই লাল কণিকা একটা কত ছোট জান ? এক্ ইঞ্চি মাপের বত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগ। আমাদের শরীরে যতটা ওজনের রক্ত আছে তার অর্দ্ধেকের বেশী হচ্ছে এই লাল-কণিকা।

শরীরের কোনো জায়গায় স্পিরিট লাগলে ঠাণ্ডা মনে হয় কেন ?

এই জন্যে যে, জল যেমন তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, স্পিরিটও তেমনি আমাদের শরীরের তাপে ও বাইরের আবহাওয়ার তাপে বাষ্প হয়ে চট্‌পট্

উবে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যে জায়গাটিতে স্পিরিট পড়ে, শরীরের সেই অংশটুকুর তাপ কমে যায়, কাজেই ঠাণ্ডা লাগে।

শীতকালে শীত করে কেন? কাঁপুনি ধরে কেন?

প্রথমতঃ আবহাওয়ার উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ব'লে। দ্বিতীয়তঃ তারই ফলে আমাদের শরীরের ভেতরে যে তাপ তৈরী হচ্ছে তাও তাড়াতাড়ি বাইরের আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ফলে শীত পায় বা কাঁপুনি ধরে। কাঁপুনিটা হয় তখন এইজন্যে—দেহকে উত্তপ্ত করার জন্য দেহের ভেতরের যন্ত্র মাংসপেশীগুলোকে সচল ক'রে তোলে। এই কাঁপুনিটাই দেহকে তখন গরম ক'রে তোলার চেষ্টা করে—কাঁপুনির ফলে দেহে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। গরম কাপড় চোপড় দিয়ে মুড়ি দিয়ে বসে থাকলে দেখবে কম শীত করবে, কারণ তখন দেহের ভেতরকার ঐ উত্তাপটা বাইরে গিয়ে আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে ঠাণ্ডা হ'তে পারে না। দেহের তাপ ভেতরে থেকেই শরীরটিকে গরম রাখে।

হাঁচি কেন হয়?

হাঁচি পড়লে বোঝা যায় যে, কোনো রোগ-বীজাণু বা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো পদার্থ নাকের ভেতর দিয়ে শরীরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে এবং তাই নাকের স্নায়ুকেন্দ্রগুলো জোর ক'রে তাকে বার করে দিতে চাচ্ছে। হাঁচি পড়ে বা হাঁচি হয় ঐ কারণেই।

স্বপ্ন জিনিসটা কি? মানুষে স্বপ্ন দেখে কেন?

স্বপ্ন জিনিসটাকে অল্প কথায় বলা চলে ঘুমের ভেতর সচেতন অবস্থা—সাধারণতঃ আমরা যখন ঘুমোই, তখন আমাদের স্নায়ুগুলো অবসন্ন হয়ে বিশ্রাম করে; ফলে বাইরের জগতের সাড়া মস্তিষ্কে পড়ে না, কিন্তু মনের গহন থেকে চেপে রাখা ইচ্ছাগুলি আবার জেগে ওঠে; অনেক 'ভুলে যাওয়া বিষয় আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ইচ্ছাগুলি তখন মনের চেতনার স্তরে

এসে সিনেমার ছবির মতো ঘটনা সৃষ্টি করতে থাকে। এই সব ঘটনাকে ঘুমের মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার নামই 'স্বপ্ন দেখা'। যাদের ঘুম খুব গাঢ় হয়, তারাও পাঁচজনের মতই স্বপ্ন দেখে, তবে তারা জাগে যখন, স্বপ্নের কথা তখন তাদের একটুও মনে থাকে না। তাই লোকে বলে যে যারা অঘোরে ঘুমোয় তারা স্বপ্ন কম দেখে।

চোখে সাবান লাগলে জ্বালা করে কেন? সাবান দিলে ময়লা অত সহজে পরিষ্কার হয় কেন?

চোখে সাবান লাগলে জ্বালা করে এইজন্যে যে, সাবানে সোডিয়াম, পটাশিয়ম, এমোনিয়ম প্রভৃতি ধাতব লবণ বা ক্ষার জাতীয় জিনিস খুব বেশী পরিমাণে থাকে এবং ঐ ক্ষারজাতীয় জিনিস আমাদের চোখের স্নায়ুগুলোতে একটা আঘাত দেয় বা সাড়া জাগায়, তাই আমরা জ্বালা অনুভব করি। সাবান দিলে ময়লা পরিষ্কার হয়, তার কারণ ময়লাকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা ও জলের সঙ্গে সহজে মিশবার ক্ষমতা দুইই আছে ঐ ধাতব লবণের।

গতিহীন সাইকেলে চড়ে স্থির হয়ে লোক দাঁড়াতে পারে না, পড়ে যায়, এর কারণ কি?

তার কারণ সাইকেলের দুটী মাত্র চাকার ওপর মানুষের ওজনটি থাকাতে তার ভারকেন্দ্র (Centre of Gravity) ওপর দিকেই থাকে অর্থাৎ ওপর দিকটাই বেশী ভারী হয়। কিন্তু এই ভারকেন্দ্রকে বজায় রেখে দাঁড়ানো সম্ভব হয় যদি ভারসমতা (Balance) থাকে ; অর্থাৎ সব দিকে যদি সমানভাবে ভারটা বজায় থাকে। সাইকেল চড়তে হ'লে Balancing বা ভারসমতা জিনিসটা একান্ত দরকার। চলন্ত সাইকেলে ভারসমতা বজায় রাখতে আমাদের চার পাশের বায়ুর চাপ ও সাইকেলের গতি (Speed) খানিকটা সাহায্য করে বলেই সাইকেল যখন চলে তখন সহজে মানুষ পড়ে যায় না, তবে যাদের Balance ঠিক হয়নি তারা তো অনবরতই আছাড় খায়!

মানুষ জলে ডুবে মরে যাবার পর ভেসে ওঠে কেন?

মানুষ জলে ডুবে মরলে প্রথমে সে জলের তলায় তলিয়ে যায়। ভেসে ওঠে মরার অনেক পরে। এর কারণ মৃত্যুর ফলে আমাদের দেহের নানা রকম পরিবর্ত্তন ঘটে—রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরধ্বংসকারী জীবাণুরা দেহকে আক্রমণ ক'রে সেটিকে পচিয়ে তোলে। এই পচন-ক্রিয়ায় দেহের ভেতরে গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তাতেই জলের চেয়ে দেহের আপেক্ষিক গুরুত্বটা কমে যায় এবং দেহটা তাই জলে ভেসে ওঠে।

রবারের জুতা পায়ে দিয়ে থাকবার খানিক পরে পা সাদা দেখায় কেন?

এইজন্যে যে, রবার সাধারণতঃ গরমে সঙ্কুচিত হয়, বাইরের উত্তাপে রবারের জুতা সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে পায়ে অতিরিক্ত চাপ পড়ে, ঐ চাপে পায়ের ঐ অংশে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে, তাই রবারের জুতা থেকে পা খুলে নিলে সাদা দেখায়।

জল, হাওয়া, আলো ও উত্তাপ

ফুটন্ত জলে চাল দিলে ফুলে ভাত হয়ে ওঠে কেন—ঠাণ্ডা জলে কেন অমন হয় না?

এর কারণ, আসলে একটি চালের দশভাগের নয় ভাগই হলো শ্বেতসার বা ষ্টার্চ্চ (Starch)। এই শ্বেতসার পদার্থ টিই হচ্ছে বিভিন্ন অনুপাত অনুযায়ী কার্ব্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের মিশ্রণে কতকগুলো খুব সূক্ষ্মদানা বা গ্রানিউল (Granule)-এর সমষ্টি। এই যে সূক্ষ্মদানা এগুলি ঠাণ্ডা জলে

গলে না বা পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং একটি অপরের গায়ে বেশী ক'রে লেগে যায়। কিন্তু গরম জলের উত্তাপে এই প্রত্যেকটি দানা বা 'গ্রানিউল' যায় ফেটে এবং তখন তাই থেকে এক রকম আঠালো পদার্থ বার হয়, তাই ফুটন্ত জলে চাল দিলে ফুলে ভাত হয়ে ওঠে।

দুধে জ্বাল দিলে সর পড়ে, অথচ জলে জ্বাল দিলে সর পড়ে না কেন?

দুধে মাখন বা চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ থাকে বলেই দুধ জ্বাল দিলে আগুনের তাপে সেটা সরের আকারে দুধের জলীয় অংশের ওপরে ভেসে ওঠে ও আস্তে আস্তে ঘনীভূত হয়ে সর হয়ে দাঁড়ায়। জলে অমন কোন মাখন বা চর্ব্বি জাতীয় জিনিস তো থাকে না, তাই সর পড়ে না।

দুধে জ্বাল দিলে উথলিয়ে পড়ে অথচ ফুঁ দিলে উথলান কমে যায় কেন?

এর জবাব হচ্ছে, দুধ যখন জ্বাল দিয়ে গরম করা হয়, তখন দুধের চর্ব্বি (Fat) ও ছানা (Casein) অংশ দুধের ওপরে ভেসে ওঠে এবং ফেনার সৃষ্টি ক'রে একটা পর্দ্দার মত তৈরী করে—যার ফলে দুধের জলীয় অংশ উত্তাপে বাষ্প হয়ে বাইরে বেরোতে না পেরে দুধটাকেই ঐভাবে ফুলিয়ে তোলে। তখন ফুঁ দিলে উথলানোটা কমে এই জন্যে যে, আমাদের মুখের বাতাসের বেগে ঐ ফেনার পর্দ্দাটা চার পাশে সরে যায়, সেই সুযোগে দুধের জলীয় অংশের বাষ্প খানিকটা বাইরে বেরোবার পথ পায়।

পাথুরে চুণে জল দিলে গরম ধোঁয়া বেরোয় কেন?

এটাকে বলা চলতে পারে রসায়নের খেলা—বিজ্ঞানের জগতে অহরহই এমন ব্যাপার ঘটছে। একটা রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে আর একটা পদার্থ মিশে আর একটা নূতন জিনিস তৈরী হচ্ছে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই। তবে এইটুকু জেনে রাখ চুণটা তৈরী হয় এক জাতীয় পাথর পুড়িয়ে। এর আর

একটা নাম হলো 'ক্যালসিয়াম কার্ব্বোনেট' (Calcium Carbonate)। রাসায়নিক মতে তাতে জল-অণু বা Water Molecule থাকে না বলেই জল পেলে তখনই তাতে উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং সেটা তখন হয়ে যায় ক্যাল্সিয়াম হাইড্রোক্সাইড (Calcium Hidroxide)।

ঘরে আগুন ধরলে চারিদিক থেকে হু হু ক'রে এত বাতাস আসে কেন?

এর সোজা জবাব হচ্ছে এই যে, বাতাসের ধর্ম্মই হ'ল, বায়ুমণ্ডলীতে যদি কোন জায়গার বায়ু কোন রকমে গরম হয়ে ওঠে, তখনই সেখানে চারিপাশের ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে যায়। তাই যেখানে আগুন লাগে সেখানে ওপরকার বাতাস হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে, আর সেইজন্যে অত বাতাস ঝড়ের বেগে সেখানে এসে হাজির হয়।

আগুনের শিখা সব সময়েই উপরমুখো হয়ে জ্বলে কেন?

ব্যাপারটা হচ্ছে, যখনই কোনও আগুন জ্বালানো হয়, তখনই বাতাসের মধ্যে যে জায়গাটুকু দখল ক'রে আগুন জ্বলছে, সেখানে, 'অক্সিজেন' ও 'কার্ব্বন' এ দুটি জিনিসের মেশামিশিতে এক রকম গ্যাস তৈরী হ'তে থাকে। এই গ্যাস আমাদের চারপাশের বাতাসের চেয়ে হাল্কা, কাজে কাজেই সেটা আশপাশের বাতাস সরিয়ে ওপর দিকে উঠে যায়, তাছাড়া ঐ ভাবে আশপাশের বাতাস ঐ গ্যাসকে ওপরে যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে নীচের দিক দিয়ে এসে আগুনের শিখায় অনবরতই অক্সিজেন যোগায়, এই জন্যই আগুনের শিখা উপরমুখো হয়ে জ্বলে সব সময়।

মাটির তৈরী হাঁড়ি, কলসী বা ইট আগুনে পোড়ালে অমন লাল হয়ে যায় কেন?

জবাব জেনে রাখো, যে মাটি দিয়ে ওগুলো তৈরী হয় তাতে 'আয়রণ-

অক্সাইড' (Iron Oxide) ব'লে পদার্থটি প্রচুর পরিমাণে থাকে। তাই ঐ সব মাটির তৈরি জিনিস যখন ভাঁটিতে পোড়ানো হয় তখন সেখানকার আগুনের তাপের মাপমতো ঐ জিনিসগুলির মাটিও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রঙ বদলে অন্য ধরণের মাটি হয়ে যায়।

রঙের স্বষ্টি হ'ল কোথা থেকে ?

এর জবাব,—আলোই হ'ল রঙের উৎস, আলো যেখানে নেই, কোনও রঙেরও অস্তিত্ব নেই সেখানে। তার কারণ আলোর সাহায্যে মাত্র দুই উপায়ে 'রঙ' যে আছে সেটা আমরা বুঝতে পারি। প্রথমতঃ রঙিন পদার্থে আলো প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সেটাকে রঙিন দেখি, দ্বিতীয়তঃ স্বচ্ছ রঙিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে যে আলো আসে সেই আলোতে আমরা রঙের আভাস পাই। সূর্য্যের সাদা আলো রামধনুর সাতটি রঙে ভাগ ভাগ হয়ে গেছে, একেই বলা হয় স্পেক্‌ট্রাম (Spectrum) বা বর্ণালী। এই যে সাতটি রং, এর মধ্যে মাত্র তিনটি রংকে বলা হয় Primary Colour বা আদৎ রং, আর বাদবাকী-গুলোকে বলা হয় Secondary Colour বা মিশেল রং। এখন আবার ঐ আলোকরশ্মির রং আর রঙিন জিনিসপত্রের রঙের দুটি আলাদা আলাদা ব্যাপার, অর্থাৎ এই Primary বা আদৎ রং তিনটি ঐ দুইক্ষেত্রে এক নয়, একটু তফাৎ আছে। জিনিসপত্তরে সাধারণতঃ যে সব রং আমরা দেখি তার মধ্যে আদৎ তিনটি রং হচ্ছে—লাল, নীল, আর হলদে। এই রং তিনটিকে আলাদা আলাদা মাপে মেশালেই আলাদা রং তৈরী হয়।

ছায়া আর প্রতিবিম্বে তফাৎ কি ?

আলোর সামনে যখন কোন জিনিস আসে, সেটি তখন আলোর পথ রোধ করে। কাজেই যে আলোকরশ্মিগুলি আটক পড়ে, ঠিক তার উল্টো দিকে সেই জায়গাটুকু অন্ধকারেই থেকে যায়.—আলোবিহীন এমন অন্ধকার অংশটুকুকেই 'ছায়া' বলা হয়। 'প্রতিবিম্ব' হচ্ছে আলোর সাহায্যে কোন পদার্থের অবিকল

রূপটির প্রতিফলিত ছবি। আয়নাতে, জলে বা ঐ ধরণের যে কোন জিনিসে, এই যে ছবি ফুটে ওঠে তাকেই বলা হয় 'প্রতিবিম্ব'।

আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়ে কেন? আর কেনই বা প্রতিবিম্বতে ডান হাতটাকে বাঁ হাত ব'লে মনে হয়?

এটা বুঝতে হ'লে আমাদের জানা উচিত যে আলোকরশ্মি খুব চকচকে পালিশ করা জিনিসে গিয়ে যখন ধাক্কা খায়, তখন কি হয়! কি হয় জানো? তোমরা জানো একটা রবারের বলকে দেওয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মারলে ফিরে আসে। বলটা যদি Right angle বা ৯০° ডিগ্রী angle-এ ছুঁড়ে মারো তাহ'লে সেটা সোজাই ৯০° ডিগ্রী angle-এ ফিরবে, আবার যদি টেরচা ক'রে ছুঁড়ে মারো, তাহ'লে যত ডিগ্রী angle-এ ছুঁড়বে, উল্টো দিকে ঠিক তত ডিগ্রী angle-এর মাপেই বলটা আসবে। আলোকরশ্মিও ঠিক ঐ ভাবেই ঠেক খেয়ে ফেরে। ধরো. যদি আমরা আয়নার সামনে দাঁড়াই তাহ'লে আলোকরশ্মি যে কোণ বা angle-এ আমাদের শরীরটাতে এসে ঠেক খেয়ে সরল রেখায় গিয়ে পড়ে ঐ আয়নার ওপর, বলের মত আবার ঠিক সেই কোণ অনুযায়ী ফিরে আসে চোখের পর্দায়—অর্থাৎ ফেরবার পথেও আলোকরশ্মির angle-এর মাপ একই থাকে; খালি গতিটা হয় উল্টো দিকে। আয়নার ওপরে প্রতিফলিত হয় আমাদের দেহের ওপরের আলোক-রশ্মি, কিন্তু উল্টো হয়ে সটান আবার আমাদের চোখের পর্দায় প্রতিফলিত হয়, কাজেই তখন আমরা আয়নার ভেতর আমাদের চেহারা দেখতে পাই, আর ঐ উল্টো দিকে আলোকরশ্মির গতি ব'লে, ডান হাতটাকে বাঁ হাত ব'লে মনে হয় অর্থাৎ সবই উল্টো দেখি। আয়নার প্রতিবিম্ব, ওটা আলোরই খেলা। সে কথাটা ভাল ক'রে বুঝতে চাও যদি খুব অন্ধকারে আয়নাতে মুখ দেখবার চেষ্টা ক'রো।

রঙিন কাপড় ভেজালে কাপড়ের রঙটা কেন বেশী উজ্জ্বল মনে হয় ও রঙটা গাঢ় দেখায় ?

কাপড় যখন ভেজে তখন কাপড়ের বুননের সুতোর ফাঁকে ফাঁকে জলের সূক্ষ্ম জল বিন্দুগুলো আশ্রয় নেয়। সেই সব জলবিন্দুতে আলো প'ড়ে আলোক-রশ্মির বক্রণ বা রিফ্রাক্‌শনটা (Refraction) ভালো ক'রে হয় আমাদের চোখে, তাই ভিজে কাপড়ের রঙের উজ্জ্বলতা বেশী মনে হয়।

জলে সাবান দিলে ফেনা হয় কেন ?

এটা বুঝতে হ'লে প্রথমেই বুঝতে হবে, ঐ ফেনা জিনিসটা কি ? ফেনা মাত্রেই হচ্ছে, কতকগুলো বুদ্‌বুদের সমষ্টি—এই বুদ্‌বুদ্‌ জিনিসটার ভেতরটা হচ্ছে ফাঁপা এবং হাওয়ায় ভর্ত্তি থাকে, এর ওপরের পাতলা আবরণটা হলো তরল পদার্থেই গড়া। সেই জন্যই বুদ্‌বুদের এই আবরণটা সব সময়েই সঙ্কুচিত হ'তে চায়—অথচ বুদ্‌বুদের ঐ ভেতরের হাওয়া তার চাপ অনুযায়ী ওপরের তরল আবরণটাকে টেনে বাড়িয়ে রাখে। এখন কথা হচ্ছে, সব তরল পদার্থেরই এভাবে হাওয়ার চাপ ভেতরে নিয়ে আবরণ বাড়াবার ক্ষমতাটা সমান নয়। এই তরল পদার্থের আবরণ বা লিকুইড সারফেস (Liquid surface) জলের বুদ্‌বুদের বেলায় সাবানের বুদ্‌বুদের চেয়ে তাড়াতাড়ি সঙ্কুচিত হয়। অর্থাৎ সাবানের জলের 'সঙ্কুচন শক্তি' (Contracting power) কম। সেই জন্যই সাবানের জলে বায়ুকে ভেতরে পূরে যেসব বুদ্‌বুদ্‌ বা ফেনার সৃষ্টি হয়—তা জলের বুদ্‌বুদের মতই চট ক'রে মিলিয়ে যায় না, বেশ খানিক-ক্ষণ স্থায়ী হয়ে রাশিরাশি বুদ্‌বুদ্‌কে এক ক'রে ফেনার সৃষ্টি করে। পরিষ্কার জলে সাবান মেশালে—সাবানের রাসায়নিক ক্রিয়ায় জলের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাতেই তার আবরণ-কুঞ্চন-ক্ষমতা বা সারফেস্‌ টেন্‌সন (Surface tension) কমে যায়। বিভিন্ন তরল পদার্থের এই আবরণীর কুঞ্চন ক্ষমতা অনুযায়ী ফেনার রকমফের হয়।

দূরের জিনিস ছোট দেখায় কেন?

অল্প কথায় হচ্ছে, যে-জিনিসটাকে আমরা দেখি তার ওপরদিকের আলোর সীমারেখাটা আর নীচের দিকের আলোর সীমারেখা পরস্পরকে কাটাকুটি ক'রে উল্টো হয়ে চোখের ভেতরের পর্দ্দায় (Retina) ক্যামেরার ফোকাসের (Focus) মতো পড়ে। ক্যামেরার ফোকাসে যেমন দূরের জিনিস ছোট দেখায়, তেমনি চোখের পর্দ্দায় দূরের জিনিস ছোট দেখায়। অর্থাৎ কাছের জিনিসের আলোর সীমারেখা দুটো কাটাকাটি ক'রে যেখানে মেশে সেখানে 'কোণটা' (Angle) হয় মাপে বড়, আর দূরের জিনিসের বেলায় 'কোণটা' হয়ে যায় ছোট, তাই চোখের পর্দ্দায় দূরের জিনিসটি ছোট আকারেই প্রতিফলিত হয়।

শীতকালে নারকেল তেল জমে যায়, অথচ সরষের তেল জমে না কেন?

নারকেলের তেলে চর্ব্বির (fat acid) পরিমাণ বেশী। চর্ব্বি বা fat acid-কে তরল রাখবার জন্যে যেটুকু উত্তাপ দরকার, বাইরের আবহাওয়াতে তখন তা পাওয়া যায় না—কারণ শীতকালে বাইরের আবহাওয়া—ঠাণ্ডা হয়ে যায় অনেক বেশী। সরষের তেলে ঐ জাতীয় চর্ব্বি (fat acid) খুব কম পরিমাণে আছে তাই ওটা শীতকালেও জমে না। তবে খুব বেশী ঠাণ্ডায় রাখলে সরষের তেলও ঘোলা হয়ে ওঠে এবং জমে যায়।

'মোমবাতি' বা প্রদীপের আগুনে ফুঁ দিলে নিভে যায় অথচ টিকে, কাঠকয়লা বা কয়লার আগুনে ফুঁ দিলে আগুন জ্বলে ওঠে কেন?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আগুন প্রথমতঃ জ্বলে 'অক্সিজেন' আর 'কার্ব্বন' এই দুটোর Combustion বা সংঘর্ষের ফলে।—কিন্তু 'কার্ব্বনের' মাপ অনুযায়ী উপযুক্ত অক্সিজেন চাই, তবে এই আগুন জ্বল্‌বে। কম বেশী হ'লে

চলবে না। মোমবাতি বা প্রদীপে কার্ব্বনের সৃষ্টি হয়—ঐ বাতির চর্ব্বি বা তেল থেকেই। কাজেই তা'তে 'কার্ব্বন' যে পরিমাণ থাকে, তার পক্ষে তোমার মুখের জোরালো ফুঁ বা দমকা হাওয়াতে মেশানো অক্সিজেনটা মাত্রায় বেশী হয়ে পড়ে। - কাজেই আগুনও নিভে যায়। অন্য দিকে কাঠ-কয়লা, টিকে বা কয়লাতে কার্ব্বন বা 'অঙ্গারের' অংশটা খুব বেশী—সেইজন্যে বাতাস বেশ জোরেই দরকার, নইলে আগুন জ্বলবেই না।

ঘাম লাগলে বা খোলা হাওয়ায় রূপা ও তামার জিনিষ কালো হয়ে যায় কেন ?

ঘামের সঙ্গে 'গন্ধক'-জাতীয় পদার্থ থাকে—এবং হাওয়াতে গন্ধকযুক্ত জলজান (Sulphurated Hydrogen) কিংবা 'সালফার ডায়ক্সাইড্' থাকে। এই গন্ধকজনিত রাসায়নিক ক্রিয়াতে রূপা ও তামার জিনিস ঘামে এবং খোলা হাওয়াতে কালো হয়ে যায়।

গ্রীষ্মকালে যত তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় ময়লা হয় শীতকালে তার চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি ময়লা হয় কেন ?

এর কারণ হচ্ছে গরমকালে আমাদের চারপাশের বায়ু গরম থাকার ফলে বায়ুর জলীয় অংশের চাপ হাল্কা হয়ে আমাদের অনেক ওপরে থাকে—কিন্তু শীতকালে বায়ুমণ্ডলীতে থাকে ঠাণ্ডার ভাগ বেশী, বায়ুর জলীয় অংশের চাপটাও থাকে বেশী কাছাকাছি, ফলে নীচের ধূলো ও ধোঁয়া গ্রীষ্মকালের মতো ওপরে উঠতে পারে না অত সহজে। সেইজন্যে শীতকালে ধূলো আর ধোঁয়াটা বেশী লাগে আমাদের গায়ে আর জামা-কাপড়ে– তাই তারা তাড়াতাড়ি ময়লা হয়।

চিল শকুন প্রভৃতি পাখীরা পাখনা না নেড়ে কি ক'রে আকাশে উড়ে বেড়ায় ?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ঐ সমস্ত পাখীরা সাধারণতঃ যে উচ্চতায় উড়ে বেড়ায়, সেখানে বায়ুর চাপ খুব বেশী, দ্বিতীয়তঃ ওদের ডানাও খুব মজবুত ;

ওরা তাই সেখানে পৌঁছায় শুধু হাওয়ায় ভর ক'রে, পাখা দুটো মেলেই হাওয়ার ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায়। সেখানকার বায়ুর চাপ এমনই যে তাদের শরীরের ভারকেন্দ্র (Centre of gravity) ভারসমতা ঠিক রেখে তারা ডানা না নেড়েই ওপরে উড়ে বেড়াতে পারে। তবে চিল শকুন যখন মাটি থেকে ওপরে উঠতে সুরু করে তখন ডানা নাড়তে হয়, কারণ সেখানকার বায়ুর চাপ, তাদের শরীরের ভারকেন্দ্রে ভারসমতা রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে আঠারো মাইল বেগে ঘুরছে অথচ পাখীরা যখন আকাশে ওড়ে তখন তারা কি ক'রে বাসায় ফিরে আসে ?

এটা কি ক'রে ঘটে জান ? পৃথিবীর মাঝখান থেকে একটা শক্তি আমাদের সব সময় টেনে রেখেছে তার দিকে, যার ফলে আমরা পৃথিবী ঘোরা সত্ত্বেও ছিটকে পড়ি না। এই যে শক্তি একে বলা হয় 'মাধ্যাকর্ষণশক্তি' ; এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে শূন্যের বায়ুমণ্ডলীকেও টেনে রেখেছে, কাজেই যখন পাখীটাকে ওপরে উড়তে দেখ, তখন সে মাটির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকলেও মাধ্যাকর্ষণশক্তির টানে বাঁধা থাকে, কাজেই সেও ঐ বায়ুস্তরের মধ্যে থেকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে এবং ঐ একই বেগে। তবে পৃথিবীর ওপরের মাটি থেকে, শূন্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার মাইলের বেশী দূরে যদি কোন রকমে পাখীটা গিয়ে পড়ে, তাহলে সে আর ফিরতে পারবে না ; কারণ অতদূর পর্য্যন্তই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টান পৌঁছায়।

দার্জ্জিলিং হলো পাহাড়ের উপর, অর্থাৎ ঐ জায়গাটি কলকাতার চেয়ে সূর্য্যের কাছাকাছি, অথচ সেখানে গরম না হয়ে ঠাণ্ডা হয় কেন ?

ঠাণ্ডা এইজন্যে যে, যদি আমরা আমাদের ওপরের বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে ওপরের দিকে যাই, তাহলে প্রতি ৩০০ ফিটে এক ডিগ্রী ক'রে বায়ুর তাপ

কমে যাবে, কাজেই সূর্য্যরশ্মির উত্তাপটাও ঐ সব জায়গায় বায়ুমণ্ডলীর ঠাণ্ডা হাওয়াতে অনেক কমে যায়, তাই ওসব জায়গা গরম না হয়ে হয় ঠাণ্ডা। তাছাড়া আর একটা কারণ, পৃথিবীর ভেতর থেকে মাটির ওপর যে উত্তাপ অহরহ বার হচ্ছে, সেটাও পাহাড়ের ওপর পর্য্যন্ত পৌছবার আগেই অনেক ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে।

শিশির-বিন্দু কি ? গ্রীষ্মকালে শিশির দেখা যায় না কেন ?

গরমকালে বাইরের গরম হাওয়া—নদী, নালা, বিল প্রভৃতি থেকে অনেক পরিমাণে Moisture বা আদ্র র্তাকে গ্রাস ক'রে ফেলে বলেই তখন 'শিশির' দেখা যায় না। কিন্তু শীতকালের রাত্তিরে আকাশ সাধারণতঃ পরিষ্কার থাকে এবং মেঘের চাপ পৃথিবীকে গরম ক'রে রাখে না, তখন মাটি, গাছ পাথর সবাই নিজের নিজের উত্তাপ ছড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই বাতাসের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে ; কাজে কাজেই বাতাসও এই সব জিনিসের সংস্পর্শে এসে ঠাণ্ডা হ'তে থাকে ; এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়া গ্রীষ্মের গরম হাওয়ার মত অতটা জলীয় বাষ্প গ্রাস করতে পারে না, ফলে খানিকটা আদ্র র্তা Moisture ঘনীভূত হয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলে পরিণত হয় এবং খোলা জায়গায় মাটিতে গাছপালায় জিনিসপত্রে আশ্রয় নেয়। গাছের পাতায়, ঘাসে লতায় এদের তাই আমরা শীতকালের সকালে উঠেই দেখতে পাই। এই জলের ফোঁটাগুলিকেই বলে 'শিশির'।

কুয়াসা জিনিসটা কি ?

কুয়াসা হচ্ছে অসংখ্য জলবিন্দুর সমাবেশ, যার প্রত্যেকটা জলবিন্দুর ভেতরে রয়েছে একটা সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা ধোঁয়ার কণা। একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপের আবহাওয়াই কেবলমাত্র কতকটা আদ্র র্তাকে বা Moisture-কে অদৃশ্য বাষ্পের আকারে গ্রাস করতে পারে। কিন্তু যখনই কোন ঠাণ্ডা পদার্থ বা ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আবহাওয়ার ওই নির্দ্দিষ্ট উত্তাপটা কমে যায়, বা

ঠাণ্ডা হয়ে আসে, তখনই সে অদৃশ্য বাষ্প তরল জলীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই জলীয় পদার্থের খানিকটা ঘনীভূত হয়ে, ঘাস গাছ, পাতাকে আধার ক'রে সেখানেই জলবিন্দু গড়ে ; সেই জলবিন্দুগুলো হ'লো 'শিশির'। কিন্তু ওই অদৃশ্য বাষ্প যখন বায়ুমণ্ডলীর ধূলিকণা বা ধূমকণাকে আধার ক'রে, তারই ওপর জলবিন্দু তৈরী ক'রে হাওয়ার দোলায় চেপে শূন্যে ভেসে বেড়ায়, তখনই তাকে 'শিশির' না ব'লে বলি আমরা 'কুয়াসা'।

সোনায় পারা লাগলে রূপার মত সাদা হয়ে যায় কেন ?

বৈজ্ঞানিকরা বলেন অগলিত সোনার সঙ্গে মিশে যাবার ক্ষমতা একমাত্র পারদ বা পারা ধাতুটিরই আছে। এর বেশী বুঝিয়ে বলতে অনেক জায়গা লাগবে এবং তা বেশ শক্ত হবে।

বাতাসটা কি জিনিস ?

রাসায়নিকেরা বলেন—বাতাসটা হচ্ছে কতকগুলো গ্যাসের সংমিশ্রণ। মোটামুটি বাতাসের শতকরা ২১ ভাগ হচ্ছে 'অক্সিজেন', ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, আর এক ভাগ হচ্ছে 'আর্গন' গ্যাস। এই তিন রকমের গ্যাস ছাড়াও বাতাসে আছে 'হিলিয়াম' 'নিয়ন' (Neon) 'জিনন' (Xenon) আর ক্রিপ্‌টন (Kripton) গ্যাস। কার্ব্বন ডায়ক্সাইড গ্যাসও খুব সামান্য আছে ব'লে জানা যায়।

কাঠ যখন আগুনে পোড়ে তখন ফট্‌ফট্‌ শব্দ হয় কেন ?

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যদি এক টুকরো কাঠ রেখে দেখ, দেখবে কাঠের ভেতরে রয়েছে অসংখ্য ফাঁক আর গর্ত্ত। এই সমস্ত গর্ত্তে হাওয়া বন্ধ হয়ে থাকে। কাজেই যখন কাঠ পুড়তে আরম্ভ করে, তখন ঐ সমস্ত গর্ত্তের বাতাস চট্‌ ক'রে গরম হয়ে উঠেই বেড়ে ওঠে ! হাওয়াটা ঐ ভাবে বেড়ে ওঠার ফলে ঐ সমস্ত গর্ত্তে চাড় লাগে এবং কাঠের খণ্ডগুলো তার ফলে নানা জায়গায় ফাটতে থাকে। এই ফাটার শব্দই আমরা শুনতে পাই যখন কাঠ পোড়ে।

ঘূর্ণি বায়ুর স্মৃষ্টি হয় কি ক'রে ?

খানিকটা খানিকটা জায়গা যখন আশপাশের বায়ুমণ্ডলীর চেয়ে বেশী গরম হ'য়ে ওঠে, তখন ঐ জায়গাটার চারধারের বায়ু ঐ গরম বায়ু ভর্ত্তি জায়গাটা দখল ক'রতে ছুটে আসে সেখানে। যদি তখন ঐ গরম জায়গার বায়ু আর ঐ চারপাশের বায়ুর উত্তাপের তফাৎটা বেশীরকম হয়, তাহ'লে ঐ চারপাশের বায়ুর ছুটে আসার গতিটাও খুব বেড়ে ওঠে ; কাজেই তখন ঐ চারপাশের ঠাণ্ডা বাতাস ঘূর্ণির আকারে ঐ ভাবে ঘুরতে সুরু করে। সেই জন্যেই এই ধরণের বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় ঘূর্ণিবায়ু।

ভূমিকম্প হয় কেন ?

এর জবাবে সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকেরা ব'লে থাকেন যে, পৃথিবীতে এই আমাদের পায়ের তলায় মাটির নীচে, অনেক নীচে, যে শক্ত পাথুরে পাহাড় আছে, সে গুলোতে 'ফাট্' ধ'রে একটা আর একটার ঘাড়ে ভেঙে পড়ে। এই যে ভেঙে-পড়া, ইংরেজীতে একে বলা হয় Faulting, এই ভাবে মাটির তলার পাথুরে পাহাড়ে চিড়্ খাওয়ার ফলে ওপরের মাটি কেঁপে ওঠে, তাকেই আমরা বলি "ভূমিকম্প"। ভূমিকম্পের আর একটা কারণ কেউ কেউ বলেন যে, "অগ্ন্যুৎপাত" বা Volcanic erruption। পৃথিবীর ভেতরের জমাট-বাঁধা উত্তাপ যখন মাটি ফুঁড়ে আগ্নেয়গিরির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে, তাতেও কাঁপন লাগে পৃথিবীর ওপরের মাটিতে, এটাও একটা কারণ বটে ভূমিকম্পের। তবে আগের কারণটাই যে বড় বড় ভূমিকম্পের স্মৃষ্টি করে, এটা বৈজ্ঞানিকরা জোর ক'রেই ব'লে থাকেন।

গরম 'ইস্তিরী' ঘসলে কাপড় যেমন সমতল ও সমান হয়, ঠাণ্ডা 'ইস্তিরী ঘসলে অমন হয় না কেন ?

তার কারণ গরম 'ইস্তিরী' কাপড়চোপড়ের স্মৃতোয় বাতাসের যেটুকু আদ্র্তা থাকে তাকে নষ্ট ক'রে তার স্মৃতোর 'অণুকণা' বা Molecules-

গুলোকে বেশী সচল ক'রে তোলে, তাতেই অতি সহজে সুতোর আড়ষ্টভাব নষ্ট হয়ে যায়। তাই তখন সহজেই কাপড়ের সুতোগুলো সমান ও টান হয়ে কাপড় জামাকে সমতল ও মসৃণ ক'রে তোলে! ঠাণ্ডা ইস্তিরীতে তা সম্ভব নয়।

সমুদ্রের জল নীল এবং লোনা কেন?

এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ রসায়নবিদ্ রিচার্ড উইল ষ্টেটারের মত হচ্ছে যে, সমুদ্রের জলে তামা মেশানো পদার্থের ভাগটা বেশী, আর বিভিন্ন সমুদ্রের জলে তামার ভাগ কম বেশী ঘটার ফলে কোন সমুদ্র কম নীল, কোনটা বা বেশী। যে সমুদ্রের জল যত নীল সেখানকার জল তত লোনা। নদীর জলের চেয়ে সমুদ্রের জল লোনা এই কারণে যে, নদীর তলার মাটি হচ্ছে বেলে-মাটি, তাতে নুণ খানিকটা শুষে নেয়, কিন্তু সমুদ্রের তলা পাথরের মত শক্ত বলেই নুণের ভাগটা ঐভাবে শুষে নেয় না, বরং রোদ লেগে নুণ শুকিয়ে বা ঘন হয়ে যাওয়ার ফলে জলের নোন্তা ভাবটা দিন দিনই বেড়ে চলেছে।

জলে-দুধে মিশ্ খায়, কিন্তু তেলে-জলে মিশ্ খায় না কেন?

দুধে আর জলে মিশ্ খায়, তার কারণ, ঐ দুটো তরল পদার্থের ভেতরে যে ছোট ছোট 'অণু' বা Molecules থাকে, তারা পরস্পরের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হতে পারে ; অর্থাৎ তারা একই মাপের Molecule, কিন্তু যখন বিভিন্ন জাতের Molecule বা বিভিন্ন মাপের Moleculeকে একসঙ্গে মেশাবার চেষ্টা করা হয় তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে না। কাজেই যে-সব জিনিস একটা আর একটার সঙ্গে মেশে না। জলের সঙ্গে তেল মেশে না সেই কারণেই—কারণ জলের 'অণু' বা Moleculeগুলো তেলের 'অণু'র চেয়ে আকারে অনেক ছোট। জলের 'অণু'কে বলা হয় 'পোলার মলিকিউল' (Polar Molecules) আর তেলের অণুগুলো হচ্ছে 'নন্-পোলার' (Non-Polar)।

শিলাবৃষ্টি হয় কেন?

বৃষ্টির সময় জলের ফোঁটাগুলো সময় সময় প্রবল হাওয়ার বেগে মাটির দিকে না এসে ওপর দিকে উঠে গিয়ে ঠাণ্ডা বায়ুর স্তরে পৌঁছায়। সেখানে পৌঁছানো মাত্রই জলবিন্দুগুলো ঠাণ্ডা লেগে বরফ হয়ে জমে যায়, আবার বায়ুর বেগ কমলেই এইগুলিই মাটিতে এসে পড়ে বৃষ্টির সঙ্গে, এই বরফের টুকরোগুলোকেই বলা হয় 'শিলা'।

হ্যারিকেনের গরম চিমনীতে ঠাণ্ডা জল দিলে বা ঠাণ্ডা কাচের গেলাসে ফুটন্ত গরম জল ঢাল্‌লে কাচ অমন ফেটে যায় কেন?

তার কারণ চিমনীটা যখন গরম থাকে তখন কাচ যে সব 'মলিকিউল' 'বা অণুকণা'য় গঠিত সেই অণুকণাগুলো উত্তাপের ধর্ম্ম অনুযায়ী উত্তাপ লাগার সঙ্গে সচল হয়ে ওঠে। উত্তপ্ত অবস্থায় সেগুলি অচলই থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডা জল শুধু চিমনীর বাইরের দিকের দেওয়ালে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অংশটুকুর অণুকণাগুলোর সচলতা যায় কমে। ফলে সেখানকার কাচটা কিছু সঙ্কুচিত হয়। অথচ চিমনীর ভেতরের দিকে 'অণুকণা'গুলো উত্তপ্ত থাকায় তাদের সচল গতি একই ভাবে থাকে এবং সেই গতিবেগ বাইরের সঙ্কোচনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে না পারার ফলেই সেখানে চাড় লেগে কাচটা অমন ফেটে যায়। ঠাণ্ডা কাচের গেলাসে ফুটন্ত গরম জল ঢাললেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে অর্থাৎ গেলাসের ভেতর দিকের কাচ-অণুগুলো সহসা বেশী সচল হয়ে উঠে বাইরে দিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারায়।

শীতকালে পুকুরের জল ঠাণ্ডা, কুয়োর জল গরম কেন?

এর কারণ শীতকালে আমাদের চারপাশের বাতাস থাকে ভয়ানক ঠাণ্ডা, সেই ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়াচ লেগে পুকুরের জল অমন কন্‌ক'নে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে—কিন্তু কুয়োর জল থাকে অনেক নীচে, সেখানে বাতাস আসা যাওয়া

ক'রতে পারে না অমন সহজ ভাবে। তাই শীতকালে কুয়োর জল গরম মনে হয়। আর ঠিক ওই কারণে গরমকালে—গরম হাওয়া কুয়োর জলের সংস্পর্শে এসেও তাকে গরম করে তুল্‌তে পারে না, তাই গরমকালে কুয়োর জল ঠাণ্ডা।

আগুনে জল দিলে আগুন নিভে যায় কেন ?

এই জন্য যে, আগুনের ওপর যখন জল ঢালা হয়, তখন আগুনের তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়, সেই জলীয় বাষ্প ভেদ ক'রে তখন বাতাস বা অক্সিজেন আগুনে পৌঁছতে পারে না, কাজেই বাতাস না পেয়ে আগুনও নিভে যায়। বাতাস ছাড়া আগুন যে জ্বলে না তাও বুঝতে পারছ।

বরফ জলে ভাসে কেন ? ঠাণ্ডায় যখন জল জ'মে যায় তখন আকারে বাড়ে না কমে ?

সমায়তনের বরফ সমায়তন জলের চেয়ে হাল্কা বলেই জলে ভাসে, অর্থাৎ জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) বরফের চেয়ে বেশী। ঠাণ্ডায় সব জিনিসই সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু ঠাণ্ডায় জল জ'মে 'বরফ' যখন হয়, তখন আকারে বেড়েই যায়। এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড যে কেন ঘটে, তা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও আবিষ্কার করতে পারেননি। তবে অনায়াসে বলা যায় বিশ্বের মঙ্গলের জন্য!

মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না কেন ?

মরুভূমির উপরেও মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়তে দেখা গেছে, তবে মাটি অবধি পৌঁছায় না, কারণ মাটিতে পৌঁছবার আগেই মরুভূমির গরম তাপে বৃষ্টির জল বাষ্প হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়। তাই মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না।

প্রতিধ্বনি কি ?

প্রতিধ্বনিটা আর কিছুই নয়, শব্দের প্রতিফলন বা শব্দের ঢেউয়ের কোন কিছুতেই ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসাটা। শব্দের ধর্ম্মই হচ্ছে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়া। কিন্তু যখন সে তার গতিপথে কোন বাধা পায় তখনই তা ফিরে

আসে। ফাঁকা ঘরে বা কুয়োর ভিতর আওয়াজ করলে জোরে প্রতিধ্বনি হয়। কারণ শব্দকে গ্রাস করার (Absorb) মত কোন জিনিস সেখানে থাকে না, কাজেই দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে বদ্ধ বায়ুতে শব্দটা ফিরে আসে। এই ফিরে-আসা শব্দটাকেই প্রতিধ্বনি হিসাবে আমরা শুনতে পাই।

বিদ্যুৎ চমকালে বা বন্দুক ছুঁড়লে আগে আলো দেখতে পাওয়া যায়, আর পরে শব্দ শুনতে পাওয়া যায় কেন?

এই জন্যে যে, আলোর গতি শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত। আর তাছাড়া বিদ্যুৎ চমকালে তার আগুনই বায়ু-তরঙ্গে ঐ শব্দের সৃষ্টি করে, কাজেই আগে আলো তার পরে তো গর্জ্জন। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল।

ইলেক্ট্রীক বাল্‌ব্‌ ওপর থেকে পড়লে অত জোরে শব্দ হয়ে ভাঙে কেন?

তার কারণ ইলেক্ট্রীক্ বাল্‌ব্‌গুলো 'ভ্যাকুয়াম' বা 'বায়ুশূন্য' হয়,—কাজেই যখন বাল্‌বটা ওপর থেকে পড়ে ভাঙে, তখন বাইরের বাতাস সঙ্গে সঙ্গে সবেগে ঐ বায়ুশূন্য জায়গায় ছুটে যায়, বাতাসের এই সংঘর্ষ থেকেই ঐ শব্দের আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং আমরা শব্দ শুনতে পাই।

ছুঁচ্‌ জলে ডোবে অথচ বড় বড় জাহাজ জলে ডোবে না কেন?

ছুঁচ্‌ জলে ডোবে, কারণ নিরেট লোহা আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী জলের চেয়ে ভারী। জাহাজ ডোবে না এই জন্যে যে, জাহাজের মাল-মশলা লোহা লক্কড়, কলকব্জা—এ সবের ওজন আর এর ভেতরে যে বাতাস থাকে, তার ওজন এক ক'রলেও জাহাজ যে-পরিমাণ জল সরিয়ে জলের ওপর ভাসে, সেই জল-পরিমাণের ওজনের চেয়ে জাহাজের মোট ওজন কম বা হাল্কা থাকে অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্বটা কমই থাকে, কাজেই জাহাজ জলে ভাসে।

নারিকেলের ভেতরে জল কোথা থেকে আসে ?

মোটামুটি জেনে রাখো যে, নারিকেলের জলটা প্রকৃতির ব্যবস্থা অনুযায়ী নারিকেল গাছের শরীরের কারখানায় তৈরী হয়। এবং জল, হাওয়া, রোদ আর গাছের শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকেই রস টেনে নিয়ে—নারিকেল ফলটি তার ঐ জলটি তৈরী ক'রে নেয়।

বর্ষাকালে লবণ বা নুণ গ'লে জল হ'য়ে যায় কেন ?

প্রথম জেনে রাখ, লবণ কি জিনিস। যখন অম্লজানের (Acid) জলজান (Hydrogen) অংশকে নষ্ট ক'রে দিয়ে—সেই মূল অম্লজানকে (Acid radical) কোন ধাতব পদার্থের (Metal) সংস্পর্শে আনা হয়, তখনই আমরা সেটাকে বিভিন্ন রকমের লবণ (Salt)এর আকারে পাই। এই লবণ-জাতীয় পদার্থ আবার দু'রকমের হয়. এক জাতের লবণ বাতাস থেকে জল টেনে নিতে পারে, সেগুলিকে বলা হয় Hygrospic salt, আর এক জাতের লবণ বাতাস থেকে জল টেনে নিতে পারে না। আমরা যে লবণ খাই—সেটা হলো Hygrospic salt, অর্থাৎ বাতাস থেকে জল টেনে নেবার ক্ষমতা তার সব সময়েই থাকে। কাজেই বর্ষাকালে বায়ুমণ্ডলীতে যখন বেশী পরিমাণে জলকণা বা Moisture থাকে, তখন ঐ লবণ বেশী পরিমাণে সেই জলকণা টেনে নিয়ে নিজেই জলের মত হয়ে গ'লে যায়।

টেলিফোনে কি ক'রে কথা শোনা যায় ?

মোটামুটি ব্যাপারটা হচ্ছে এই, তুমি যেই টেলিফোনে কথা বললে, অমনি তোমার কথার শব্দ থেকে 'শব্দ-ঢেউ' (Sound waves), তৈরী হলো। সেই ঢেউ টেলিফোনের মাউথপিস্ বা যেখানে মুখ রেখে কথা বলছো—তার ভেতর দিয়ে গিয়ে সেখানে যে 'ডায়াফ্রাম' (Diaphragm) আছে তাকে কাঁপিয়ে তুললে—এবং ডায়াফ্রামের নীচেই ঠিক মাঝখানে বোতামের মত যে জিনিস আছে—সেটাও তখন কাঁপতে লাগল ঐ কাঁপনের ঢেউ লেগে। এই বোতাম বা Button-এর নীচেই আবার খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সব কার্ব্বনের গুঁড়ো রাখা আছে

এবং এই গুঁড়োগুলির মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক কারেণ্ট বা বৈদ্যুতিক প্রবাহ অনবরতই যাওয়া আসা করছে। এখন শব্দের ঢেউয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ঐ বোতামটির চাপ কখনও বেশী কখনও কম হয়ে পড়ছে ঐ কার্ব্বনের গুঁড়োর ওপর। যখন কার্ব্বনের গুঁড়োর ওপর বেশী চাপ পড়ছে তখন কারেণ্টও বেশী যাচ্ছে—যখন চাপ পড়ছে কম, তখন কারেণ্টও কম যাচ্ছে। এইভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের যে পরিবর্ত্তন হচ্ছে, ঠিক সেই মত কখনও কম কখনও বেশী কারেণ্ট তার বেয়ে চলে যাচ্ছে, যে তোমার কথা শুনছে তার রিসিভার যন্ত্রে। সেখানে পৌছেই ঐ কারেণ্টটা আবার একটা ছোট্ট ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগনেটের 'তার-কুণ্ডলী' বা কয়েলের (coil) ভেতর দিয়ে গিয়ে 'রিসিভার-যন্ত্র' বা যেটি শ্রোতার কানে লাগানো আছে তার 'ডায়াফ্রাম'কে কাঁপিয়ে তুলছে। এই কাঁপন আবার সেখানের বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। এই শব্দ-তরঙ্গই স্নায়ু মারফৎ শ্রোতার মস্তিষ্কে কথার অনুভূতি জানায়। তখনই টেলিফোনে কথা শোনা যায়।

খালি ঘরে কথা বল্‌লে আওয়াজটা গম্‌গমে হয় কেন?

এর কারণ, আমাদের চারপাশের আস্‌বাবপত্র সব কিছুই বাতাসের শব্দ-তরঙ্গ থেকে কিছু শব্দ গ্রাস ক'রে নেয়। খালি ঘরে ঐ ধরণের কিছু থাকে না ব'লে—শব্দতরঙ্গ শক্ত দেওয়ালে ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয় এবং তাই আওয়াজটা খুব গমগমে হয়—ইটের দেওয়াল দেওয়া ঘরে আওয়াজ যতটা গম্‌গমে হয়, কাঁচা মাটির বা কাঠের দেওয়াল-দেওয়া ঘরে ততটা গম্‌গমে হয় না। তার কারণ, কাঠ বা নরম মাটির শব্দ গ্রাস করবার ক্ষমতা আছে ইটের চেয়ে বেশী।

গ্রামোফোন রেকর্ড কথা ও সুর কেমন ক'রে তোলে?

সব কথা বলতে অনেক জায়গা লাগবে। মোটামুটি জেনে রাখো প্রথম যাঁর গান বা কথা রেকর্ডে তুলতে হয়—তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ষ্টুডিওতে।

সেখান থেকে তাঁর গলার আওয়াজটাকে বা 'শব্দতরঙ্গ'গুলোকে "মাইক্রোফোন" ব'লে একটা যন্ত্রের সাহায্যে 'বিদ্যুৎ-তরঙ্গে' পরিণত ক'রে নেওয়া হয় রেকর্ডিং রুমে। এখানে ঠিক গ্রামোফোনের মতই একটা কলে রেকর্ডের বদলে রাখা হয় রেকর্ডের মাপমতই একটা এক ইঞ্চি পুরু 'মোমের' চাকৃতি। এই চাকৃতিটা প্রতিমিনিটে ৭৮ বার ঘোরে। এর পর যখন গায়ক ও বক্তার গলার আওয়াজ লাউড্‌স্পীকারে ঠিকমতো পাওয়া যায়, তখন ঐ মোমের চাকৃতির উপর একটা পিনের মত জিনিস ছুঁইয়ে দেওয়া হয়, ঠিক যেমন ক'রে তোমরা গ্রামোফোন বাজাবার সময় 'সাউণ্ড-বক্সে' পিনটা লাগিয়ে রেকর্ডের উপর আস্তে আস্তে রাখো, ঠিক তেম্‌নি ক'রে। গায়কের গলার স্বর বা শব্দ-তরঙ্গ বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে বিদ্যুতের ঢেউ ঐ মোমের চাকৃতির ওপরের পিনটাকে নাচাতে ও কাঁপাতে থাকে ; ওদিকে চাকৃতিটা তো ঘুর্‌ছেই ; ফলে রেকর্ডের উপর খাঁজগুলো সরু দাগের আকারে পরপর গড়াতে থাকে। উপরন্তু শব্দের জোরের কম বেশী অনুযায়ী 'পিন'টি নেচে নেচে কথনো বেশী গর্ত্ত করে কথনো কম গর্ত্ত করে, অর্থাৎ রেকর্ডের ওপর ঐ যে লাইনগুলো দেখ, ওর ভেতরে আছে পাহাড়ের মত উঁচু নীচু জায়গা, তাছাড়া পিনের কাঁপনের ফলে আবার ঐ খাঁজের দেওয়ালগুলোও শব্দের কাঁপন অনুযায়ী ঢেউখেলানো হয়ে যাচ্ছে। ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে রেকর্ডের লাইনগুলো নদীর মত আঁকাবাঁকা আর তার ভেতরটাও উঁচু নীচু। গ্রামোফোন বাজাবার সময় পিনটা ঐ উঁচু নীচু জায়গার ওপর দিয়ে গিয়ে খাঁজের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে এগিয়ে চলে, ফলে 'পিন'টা সেই শব্দ-তরঙ্গগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে 'সাউণ্ড-বক্সে'র ডায়াফ্রামে (Diaphragm), তাই আমরা রেকর্ডে গান শুন্‌তে পাই। এখন ঐ যে মোমের চাকৃতিটা তৈরী হ'লো, ঐটাই হ'লো আসল রেকর্ড। ওর থেকে তখন Electrotyping উপায়ে ছাঁচ তৈরী ক'রে তার ওপর পিচ, রজন প্রভৃতি জিনিস মেশানো, কনডেন্‌সাইট (Condensite) ব'লে

একরকমের কালো জিনিস চেপে ধ'রে ছাপ নেওয়া চলে অন্য আর একটা কলে। ঐগুলোই হলো আমাদের গ্রামোফোন রেকর্ড।

গ্রামোফোন যন্ত্রে সাউণ্ডবক্সে পিন লাগিয়ে রেকর্ডের ওপর ধরলে শব্দ হয় কেন?

আগেই ত বলেছি রেকর্ডের দাগের ভেতরের উঁচু নীচু জায়গায় আর খাঁজের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পিনটা শব্দ-তরঙ্গের (Sound waves) সৃষ্টি করে এবং সেই শব্দ-তরঙ্গকে শব্দে রূপান্তরিত করবার ব্যবস্থা থাকে ঐ সাউণ্ড-বক্সটির ভেতরে। শব্দ-তরঙ্গ ঐ সাউণ্ড-বক্সের ভেতর ডায়াফ্রাম (Diaphragm)টি এমনভাবে কাঁপায়, যার ফলে আমাদের এবং গ্রামোফোনের চারপাশের বায়ুস্তরেও শব্দের কাঁপন জাগে এবং সেই কাঁপন তখন আমাদের কানের ভেতরের পর্দ্দায় (Tympanum) গিয়ে ধাক্কা দেয়, তাই তখন আমরা রেকর্ডের শব্দ শুনতে পাই।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারের পোষ্ট (Post)-গুলোতে কান দিলে শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যায় কেন?

এর কারণ, টেলিগ্রাফের বা টেলিফোনের তারের ওপর দিয়ে সব সময়েই বাতাস বয়ে যাচ্ছে এবং সেই বাতাসের ঢেউ লেগে তারে যে কাঁপন সৃষ্টি হচ্ছে সেটাই শব্দের সৃষ্টি করছে বাতাসে। আর সেই শব্দ-তরঙ্গ ঐ কাঁপা থামগুলোর ভেতরও শব্দের আলোড়ন আনে। কাজেই ঐ ভাবে শব্দ শোনা যায়।

গাছ তো তার পাতা আর শেকড় দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে, তবে গাছের ছাল কাটলে গাছ মারা যায় কেন?

এর কারণ গাছের শেকড়ই—জল এবং জলের আকারে খনিজ লবণ ইত্যাদির রস টেনে নিয়ে গাছের শরীরের পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা করে, কিন্তু আমাদের শরীরের ভেতর যেমন শিরা উপশিরার মারফৎ রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা আছে, গাছের শরীরেও বিভিন্ন তন্তু বা (Tissue) টিস্যুর মারফৎ পাতা এবং বোঁটায় সেইভাবেই সেই রস পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত Tissue বা গাছের সূক্ষ্ম শিরাগুলি থাকে ঐ গাছের ছালের নীচেই, কাজেই গাছের ছাল কেটে নিলে গাছের খাদ্য পাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা হয়, তাই গাছ ম'রে যায়।

গাছের বয়স ঠিক করা যায় কি ক'রে?

গাছের বয়স ঠিক করতে হ'লে, গাছকে আড়াআড়ি ভাবে কাটলে দেখা যাবে তার ছালের নীচেই রয়েছে গাছের 'কাণ্ড' বা গুঁড়ি, গুঁড়িটা আবার কতকগুলো স্তরের সমষ্টি। প্রত্যেক বছর গাছের গুঁড়িতে এই রকম একটী ক'রে স্তর পড়ে, গুঁড়িতে যতগুলি স্তর দেখতে পাবে, গাছের বয়স তত বছর।

কোন্ গাছ সব চেয়ে বেশীদিন বাঁচে?

আমাদের দেশে অশ্বথ আর বটগাছ সব চেয়ে বেশীদিন বাঁচে। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক মিঃ ফ্রান্সিস্ জর্জ্জহিথ বিলাতের গাছগুলো কে কতদিন বাঁচে তার একটা হিসাব বার করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, 'সিডার' গাছ (Cedar) বাঁচে ২০০০ বছর, 'ইউ' গাছ বাঁচে ৩২০০ বছর ; সব চেয়ে বেশী নাকি এই গাছের পরমায়ু।

কোন্ গাছ সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে?

সব চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে বাঁশ জাতের গাছ—কোনও কোনও জাতের বাঁশ রাতারাতি এক ফুট বাড়ে, এমনও নাকি দেখা যায়।

অধিকাংশ গাছের পাতাই সবুজ হয় কেন ?

অধিকাংশ গাছের পাতাই সবুজ এই জন্যে যে, গাছের পাতা সূর্য্যরশ্মির সাতটা রঙের মধ্যে যে লাল ও বেগুনে রং থাকে তা গ্রাস ক'রে নেয়, কিন্তু সবুজ রঙকে গ্রাস করে না। গাছের পাতা এই সবুজ রং থেকে তার জীবনী-শক্তি সংগ্রহ করে। এই জীবনী-শক্তি ছোট ছোট অণুর আকারে পাতার ভেতরের কোষে কোষে ভাসতে থাকে। এই সূক্ষ্ম অণুগুলিকে বলা হয় 'ক্লোরোপ্লাষ্ট' (Chloroplast), এর মানে করতে পার সবুজ 'জীবনী-শক্তি'। যে পদার্থটি অহরহ এই অণুগুলিকে সবুজ ক'রে রাখে তাকে বলা হয় ক্লোরোফিল্ (Chlorophyll)। এর সৃষ্টি সূর্য্যের আলো থেকেই। গ্রীক ভাষায় 'Chloros' কথাটির মানে সবুজ। আর 'Phyllon' কথাটির মানে 'পাতা', তার থেকেই কথাটির উৎপত্তি।

গাছের পাতা হয় কেন ?

গাছে পাতা হয় এই জন্যে যে, গাছকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে গাছের খাবার যে রস, তা ঐ পাতারাই জমিয়ে রাখে তাদের কোষগুলোতে। এ ছাড়া পাতার আরও অনেক কাজ আছে,—গাছের জন্য সূর্য্যের আলো ধরা,—বাতাস থেকে কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস টেনে নিয়ে গাছকে বড় ক'রে তোলা, সে সব করে ওই পাতারা। গাছের শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ঐ পাতারাই করে। পাতা ছাড়া গাছের ডালপালা বা শেকড় এ কাজগুলি করতে পারে না।

গাছের পাত হলদে হয়ে ঝরে যায় কেন ?

দিনের পর দিন গাছটি গাছের পাতায় 'ক্লোরোফিল' (Chlorophyll) তৈরী করবার উপযোগী রস জোগায় বলেই আমরা গাছের পাতাকে সবুজ দেখতে পাই। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন পাতার কোষ বা 'cell'-গুলো গাছের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনমত 'সব জিনিসের জোগান' আর পায় না। এটা সাধারণতঃ ঘটে ঋতু বা আবহাওয়া অনুযায়ী। কারণ

আসলে গাছরা ভারী হুঁসিয়ার, সে যখন দেখে যে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রসের জোগানটা কমে আসছে, তখনই সে তার পাতায় পাতায় 'ক্লোরোফিল' তৈরী করবার উপযোগী রসের জোগান দেওয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে শুধু শেকড়, গুঁড়ি আর ডালপালাকে রস জুগিয়ে আসল দেহটাকেই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। কাজেই তখন রসের জোগান না পেয়ে পাতাগুলোর 'জীবনী-শক্তি' যায় কমে, 'ক্লোরোফিল্' (Chlorophyll) তৈরী না হওয়াতে পাতাগুলোর ভেতরে হলদে রং 'ক্যারেটিন' দেখা যায়, তাই অমন হলদে হয়ে গিয়ে কুঁচকে, কুঁক্‌ড়ে ঝরে পড়ে।

কোন্ গাছ সবচেয়ে আস্তে আস্তে বাড়ে?

'লিচেন' (Lichen) ব'লে একরকম গাছ আছে, যার বাড় অত্যন্ত কম। পঞ্চাশ বছরে এই গাছ একহাতের বেশী বড় হয় না, কিন্তু এই গাছ বেঁচে থাকে প্রায় দুশো বছর।

লজ্জাবতী লতা ছুঁলেই পাতাগুলা কুঁক্‌ড়ে যায় কেন?

এ প্রশ্নের জবাব বৈজ্ঞানিকেরা সঠিক আবিষ্কার করতে পারেন নি, তবে একটু জেনে রাখ যে, গাছেরও জীবনীশক্তি আছে। জীব-জগতে স্নায়ুস্পন্দনের সাহায্যেই এই ধরণের ব্যাপার ঘটে। সেই আন্দাজ ক'রে বলা চলতো এটা ঐ গাছের স্নায়ুতে সাড়া জাগায়, কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, স্নায়ু বলতে যা বোঝায় তা গাছপালার নেই। তাই এখনও এই ব্যাপারটা একটা রহস্য।

বসন্তকালে গাছপালার নতুন পাতা হয় কেন?

তার কারণ বসন্তকালেই চারপাশের আবহাওয়ার উত্তাপ ও রৌদ্র সবচেয়ে বেশী পরিমাণে গাছপালার উপযোগী খাদ্য তৈরী ক'রে দিতে সক্ষম হয়, তখন তারা মাটি থেকে বেশী রস পায়, আকাশ থেকে বেশী রৌদ্র পায়, তাই তারা তখন পায় নতুন জীবন। গাছপালার জীবনে ঐ দুটোই সবচেয়ে বেশী দরকার —এটি নিশ্চয়ই জান। বসন্তকালে আলো, হাওয়া, জল উপযুক্ত পরিমাণে

পেয়ে শুধু গাছপালা নয়, সব জীবজন্তু আর মানুষের মধ্যেও নূতন জীবনের সাড়া জাগে।

কোন্ গাছের পাতা আকারে সব চেয়ে বড় হয় ?

সব চেয়ে বড় আকারের পাতা দেখা যায় সিলোন বা সিংহলে 'টালিপট পাম' ব'লে তাল জাতীয় গাছ আমাদের দেশের তালপাতার মতই দেখতে, তবে তার চেয়ে অনেক বড় হয়। এই পাতা দিয়ে সেখানে ছাতা তৈরী হয়।

ফুলের গন্ধ আসে কোথা থেকে ? ফুলের কেন গন্ধ থাকে ?

ফুলের গন্ধটা সাধারণতঃ আসে—গাছ তার শরীরের ভেতরে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় যে তেল বা গন্ধসার (Essence) উৎপাদন করে তার থেকেই। এই ফুলগাছের যে তেলটি তৈরী হয়, সেটি কি ভাবে হয়? সে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক তথ্য। তবে এই যে তেল, সেটা সাধারণতঃ পেট্রোল বা তারপিন তেলের মত হাওয়ায় উড়ে যায়, অর্থাৎ তাই আমরা গন্ধ পাই। ফুলের যে সুগন্ধ হয় এর দরকার কি ? এর দরকার তোমার আমার জন্য নয়—গাছের নিজের দরকারেই তারা করে এই গন্ধের সৃষ্টি এবং ফুলে যে মিষ্টি গন্ধ থাকে সে গন্ধ পাই না আমরা গাছের পাতায় বা গাছের শেকড়ে। গাছ তার সুগন্ধটি ফুলেই জমিয়ে রাখে, তার কারণ ফুলের রেণু থেকেই হয় বীজের সৃষ্টি, কিন্তু এই ফুলের রেণু মৌমাছি, প্রজাপতি বা ঐ ধরণের পোকামাকড়—যারা ফুলকে ফলে পরিণত করে বা অন্য উপায়ে বীজ সৃষ্টির সাহায্য করে, তাদের আকর্ষণ করার জন্যেই ফুল গন্ধ ছড়ায় আকাশে বাতাসে চারিদিকে। তাছাড়া ফুলের গন্ধের ঝাঁঝে—গাছের পক্ষে ক্ষতিকর বহু ছোট ছোট বীজাণুও নষ্ট হয়। প্রজাপতি, মৌমাছি প্রভৃতি জাতির পোকামাকড় রং ও গন্ধ নাকি খুব সহজেই অনুভব করতে পারে।

সব ফুলে সুগন্ধ থাকে না কেন?

তার কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত ফুলের রেণুই যে মৌমাছি, প্রজাপতি বা কীটপতঙ্গের সাহায্যে বীজে পরিণত হয়—তা নয়, চারিধারের বাতাসই অনেক সময় কোনও কোনও ফুলের রেণু সংগ্রহ ক'রে নিয়ে, উড়িয়ে ফেলে নতুন ফুলে এবং তাতেই বীজের সৃষ্টি হয়, কাজেই সে ক্ষেত্রে প্রজাপতি, মৌমাছি বা কোন কীটপতঙ্গকে টেনে আনার জন্য সেই সমস্ত ফুলের একেবারেই গন্ধের দরকার হয় না, তাই সব ফুলে সুগন্ধ থাকে না।

সবুজ রঙের ফুল দেখা যায় কি না?

খাঁটি সবুজ রঙের ফুল বড় একটা দেখা যায় না। এদেশের কাঁঠালী চাঁপা ফুলের রঙটা গোড়াতে প্রায় সবুজ থাকে, তার পরে হলদে হয়ে যায়। খাঁটি সবুজ রঙের ফুলও ফোটানো হয়েছিল উদ্ভিদবিদ্‌দের চেষ্টায় ১৮৫০ সালে, 'বাল্টিমুরে'। এই ফুলটি 'ভিরডিফ্লোরা' ব'লে গোলাপ জাতের গাছে ফুটেছিল।

সূর্য্যমুখী ফুল সব সময়ে সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে কেন?

এর কারণ গাছপালা আর ফুল এদের মধ্যে কারুর কারুর সূর্য্যের দিকে আকর্ষণটা খুব বেশী থাকে, এবং তাদের এই আকর্ষণ বা টানের ধর্ম্মকে ইংরেজীতে বলা হয় "Heliotropism"। এই "Heliotropism" সূর্য্যমুখী ফুলে খুব বেশী থাকে, অর্থাৎ সূর্য্যকিরণটা প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী তার একান্ত প্রয়োজন, সেই কারণেই সূর্য্যমুখী ফুল ঐ ভাবে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

ডুমুরের ফুল হয় না কেন?

ডুমুরের ফুল হয় না একথাটা সত্যি নয়, কারণ যে ডুমুর ফলটি দেখ, ওটিই আসলে ডুমুরের ফুল। একটা ডুমুর ফল যদি 'দু' আধখানা ক'রে কেটে আতস কাচ দিয়ে দেখ, দেখবে তার ভেতরে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট

ফুলের কুঁড়ির মত জিনিস, এগুলিই ডুমুরের ফুল। ইংরেজীতে এই ছোট ছোট ফুলের মত জিনিসকে বলা হয় Florets.

সব চেয়ে বেশী দিন ফল দেয় কোন্ গাছ ?

নাসপাতি বা 'পিয়ার' গাছ ৩০০ বছর পর্য্যন্ত বেঁচে থেকে ফল দেয়, এটা নাকি দেখা গেছে। সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী ফল দেয় আখরোট গাছ। এক এক বছরে একটা আখরোট গাছে নাকি ১ লক্ষ আখরোট ফল ফলেছে এও দেখা গেছে।

কলাগাছ একবার ফল দিয়ে আর ফল দেয় না কেন ?

কারণ কলা গাছ হচ্ছে ওষধি শ্রেণীর গাছ। এই ওষধি শ্রেণীর গাছের সারা জীবনে একটি মাত্র ফুল ফোটে এবং এই ফুলটির বোঁটাটি গাছের মূল থেকে গজিয়ে গাছের কাণ্ডের মাঝখান দিয়ে ফুলের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কাজেই ফুলটি একবার ফল দেবার সঙ্গে সঙ্গে গাছটির আর দ্বিতীয় ফুল ফোটাবার উপায় থাকে না। কলাগাছের ফুল হচ্ছে মোচাটা। আর ফুলের বোঁটাটা হচ্ছে থোড়।

অনেক ফল কাঁচা অবস্থায় টক, অথচ পাক্‌লে মিষ্টি হয় কেন ?

এর কারণ কি জানো ? কাঁচা অবস্থার ঐ ফলগুলো সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয় না। প্রকৃতির কারখানায় সব জিনিসই তৈরী হচ্ছে বাঁধাধরা সময়ের মাপকাঠিতে, ঠিক ওই বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরীতে যেমন ক'রে সব জিনিসই তৈরী হয়। ফল যখন ষোল আনা পুষ্ট হয়, তখন সেটা পাকে ; কাজেই আম, কমলা-লেবু যখন পাকে, তখন তাতে কার্ব্বন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যেটি যতটুকু থাকা দরকার, মাপমতো ঠিক সেটি ততটুকুই পাওয়া যায়, তার আগে তা পাওয়া যায় না। এই তিনটে জিনিসই অনুপাত অনুযায়ী এক সঙ্গে মিশ খেয়ে তখন ফলগুলোর ভেতরে চিনির সৃষ্টি করে এবং তাই অধিকাংশ

ফল পাকলে মিষ্টি লাগে। তবে অনেক ফল পাকলেও টক থাকে, তার কারণ তাতে Acidএর ভাগটা চিনির ভাগের চেয়ে বেশী থাকে।

রাত্রিতে যে-সব ফুল ফোটে সেগুলো সাদা হয় কেন?

রাত্রিতে যে সব ফুল ফোটে, সেগুলো সাধারণতঃ সাদা হয়, তার কারণ তারা সূর্য্যরশ্মি থেকে কোন রং শুষে নেবার সুযোগ পায় না।

ব্যাঙের ছাতা জিনিসটা কি?

যে জিনিসটাকে আমরা 'ব্যাঙের ছাতা' বলি—ওটা হলো নীচুজাতের উদ্ভিদ—সাধারণতঃ গাছগাছড়ার মতো ও-গুলোর রৌদ্র থেকে (Chlorophyll) 'ক্লোরোফিল' বা সবুজ জীবনীশক্তি সংগ্রহ করবার ক্ষমতা নেই। আর তাছাড়া সাধারণ উদ্ভিদের সঙ্গে ওর তফাৎ হ'ল যে, ওর না আছে শিকড় না আছে গুঁড়ি, পাতা—তাও নেই। ওটা বাড়ে অন্যান্য জৈব পদার্থ বা উদ্ভিদের খাদ্যে ভাগ বসিয়ে—তাই ওকে ফেলা হয় ফান্জি (Fungi) শ্রেণীতে। ব্যাঙের ছাতা নাম হয়েছে এইজন্যে যে, সাধারণতঃ এগুলো স্যাঁৎসেঁতে বা জলা জায়গায়, যেখানে ব্যাঙেরা থাকে সেইখানেই জন্মায়, এবং ছাতার মত দেখতে হয়। সময় সময় ব্যাঙেরা ঐগুলোর তলায় বসে থাকে—তাই সবাই ব্যাঙের ছাতা বলে।

পুকুরে 'পানা' জাতীয় যে গাছ দেখা যায় তার শেকড় কি জলের নীচে মাটিতে থাকে?

না। 'পানা' বা 'কচুরীপানা'-গাছ জলের উপরেই ভাসে—এদের শেকড়ের সঙ্গে মাটির কোনও যোগাযোগ নেই। 'পানা' ও 'কচুরিপানা'-গাছের শেকড়ে হাওয়া ভর্ত্তি থলির ব্যবস্থা আছে, তারই সাহায্যে ঐ গাছগুলো জলের ওপরে অমন ভেসে থাকে।

৬

জীব-জগৎ

কুকুর জিভ্ বার করে হাঁপায় কেন?

গরমকালে আমরা দেখি কুকুরগুলো সাধারণতঃ জিভ বার ক'রে হাঁপায়, কিন্তু বিড়ালেরা অমন করে না। এর কারণ,—আমরা গরমে পরিশ্রান্ত হ'লে আমাদের শরীরকে ঠাণ্ডা ক'রে ঠিক উত্তাপে আনবার জন্য আমাদের গায়ে ঘাম দেয় এবং আমাদের ঘর্ম্মগ্রন্থি থেকে জল বেরিয়ে বাতাসে উবে যাওয়ার ফলে আমাদের চামড়াটা ঠাণ্ডা হয়, তাতেই আমরা স্বস্তি বোধ করি। কুকুরদের ও-রকম গা-ঘামার তেমন কোনও ভাল ব্যবস্থাই নেই। কারণ ওদের ঘর্ম্ম-গ্রন্থিগুলো আছে মাত্র পায়ের থাবায়, তাই ওরা গরমের দিনে ওভাবে জিভ বার ক'রে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখে।

বিড়ালের চোখ রাত্রিতে জ্বলে কেন?

শুধু বিড়ালের চোখ নয়, রাত্রিতে আরও অনেক জীবজন্তুর চোখ ও-রকম জ্বলে; এর কারণ হচ্ছে মানুষের মতই বিড়াল বা এই সমস্ত জীবজন্তুরও দেখবার জন্য ক্যামেরার লেন্সের মত জিনিসটা ছাড়াও চোখের ভেতরের দেওয়ালে 'ট্যাপেটাম' বলে একটা পদার্থের প্রলেপ থাকে। এই 'ট্যাপেটাম' থেকে এক রকম উজ্জ্বল আলো তাদের চোখের পর্দ্দা বা রেটিনায় প্রতিফলিত হয় ও জীবগুলিকে অন্ধকারের মধ্যে দেখবার শক্তি দেয়। এই আলো দিনের আলোয় দেখা যায় না, রাত্তিরেই দেখা যায়, তাই মনে হয় রাতের বেলায় বিড়ালের চোখ জ্বলে।

মাছি যখন পা উপর দিকে করে ঘরের ভিতরের ছাদে হেঁটে বেড়ায় তখন পড়ে যায় না কেন?

এর কারণ, মাছিদের প্রত্যেকটি পায়ে একটা প্যাডের মত চাকতি থাকে। এগুলো এমনভাবে তৈরী যে দেওয়ালে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সেটি বায়ুশূন্য হয়ে দেওয়াল বা ছাদের গায়ে কামড়ে ধরে। তাই মাছি উল্টো হয়ে যখন ঘরের ভিতরের ছাদে হেঁটে বেড়ায়, তখন পড়ে যায় না।

গরু কোন কিছু খাবার পর আবার জাবর কাটে কেন?

এর কারণ গরুর খাবার হজম করার ব্যাপারটা একটু অন্য ধরণের। মানুষ কোন কিছু খাবার পর,—মানুষের খাবারটি পাকস্থলীতে যাবার পরই হজম হয়ে যায়। গরুর সেরকম ব্যবস্থা নেই। গরুর পাকস্থলীটা চারভাগে ভাগ করা। গরু কোন কিছু খাবার পর খাবারটা পাকস্থলীর 'পাউচ' বা ১নং অংশে হাজির হয়, সেখানে খানিকটা নরম হবার পর সেটা যায় পাকস্থলীর ২নং অংশে। পাকস্থলীর এই দুটি অংশ থেকেই গরু ইচ্ছামত তার খাওয়া-খাবারটি মুখে এনে হাজির করতে পারে। এই ভাবে মুখে খাবার ফিরিয়ে এনে সে আবার চিবিয়ে সেটাকে গিলে ফেলে, তখন খাবারটা প্রথমে পৌছায় পাকস্থলীর ৩নং অংশটিতে, সেখান থেকে তারপর যায় পাকস্থলীর ৪নং অংশে। সেখানে খাবারটা পুরোপুরি হজম হয়ে যায়। শুধু গরু নয়, যে সব জানোয়ারের পায়ের ক্ষুর দু'ভাগে চেরা তারাই জাবর কাটে এটাও জেনে রাখো।

গরু ঘাস, খড়, খোল খায়—কিন্তু তাই থেকে দুধ হয় কি করে?

প্রশ্নটা সোজা হ'লেও জবাবটা খুব সোজা নয়। জেনে রাখো ঘাস খড়ের থেকেই দুধটা তৈরী হয় না। সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের দেহে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থি বা গ্লাণ্ডস (Glands) আছে। এই সব গ্রন্থির কতকগুলির কাজই হলো—শরীরের রক্তপ্রবাহ থেকে জল ও অন্যান্য জিনিস টেনে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের লালা বা রস (Secretion) তৈরী ক'রে শরীরের নানা কাজে লাগানো; আগেই যেমন পড়েছ চোখের গ্ল্যাণ্ড অশ্রুগ্রন্থির কাজ হলো চোখের জল তৈরী করা, থুথু বা লালা তৈরী করে জিভের স্বাদগ্রন্থিগুলো—তেমনি ঐ দুধটাও জীব-বিশেষের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থির সাহায্যে তাদের দেহের রক্ত থেকেই তৈরী হয়। দুধটা জীবমাত্রের সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার উপযোগী খাদ্য হিসাবেই তৈরী হয়।

কুকুরগুলো রাত্রিবেলায় বেয়াড়া সুর করে ডাকে কেন?

পশুবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, কুকুরের পূর্ব্বপুরুষেরা আদিকালে শেয়ালের মত দল বেঁধেই জঙ্গলে বাস করতো। শেয়ালরা যেমন দল বেঁধে রাত্রিবেলা হুক্কা হুক্কা ডাক ডেকে তাদের জাত ভাইদের জড়ো করে কুকুররাও সেকালে অমনি ক'রে রাত্রিবেলায় জাতভাইদের ডেকে এক দলে জড়ো করতো! প্রাচীন কালের সেই স্বভাবটি এখনও তারা ষোল আনা ভুলতে পারেনি বলেই অমনি বেয়াড়া সুরে রাতের বেলায় ডাক ছেড়ে তাদের দলবলকে দলে ডেকে নেবার চেষ্টা করে।

গরুর মত চিবিয়ে না খেয়ে কুকুর গিলে খায় কেন?

গরু চিবিয়ে বা জাবর কেটে যেমন করে খায়, কুকুর তেমনি ক'রে না খেয়ে কোঁৎ কোঁৎ ক'রে গিলে খায় এইজন্যে যে, কুকুরের মুখে চিবোবার উপযোগী কষের দাঁতও নেই, আর জাবর কাটার ব্যবস্থাও নেই।

বিড়ালকে উঁচু থেকে ফেলে দিলে আঘাত পায়না কেন?

এই জন্যে যে, প্রকৃতি তার শরীরের গড়ন আর ওজন এমনভাবে তৈরী করে দিয়েছে, যে, সে যখনই ওপর থেকে পড়বে, তখনই তার চারটী পায়ের থাবার ওপর ভর করেই পড়বে, যার ফলে তার শরীরে চোট লাগবে না। এ ব্যবস্থাটা প্রকৃতি করেছে এই জন্যে যে, বিড়ালকে তার খাবার-দাবার সংগ্রহ করবার জন্যে আনাচে কানাচে, কার্নিশে বা গাছের ডালের মত বিপজ্জনক উঁচু জায়গা দিয়ে চলাফেরা করতে হয় ব'লে। ঐসব জায়গা থেকে পা পিছলে পড়বার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, কাজেই ওভাবে প্রকৃতি তাকে বাঁচতে সাহায্য করেছে।

মাছকে খাবার দিলে চিবিয়ে না খেয়ে গিলে খায় কেন?

তার কারণ মাছদের শ্বাসপ্রশ্বাস নেবার জন্য অনবরতই মুখ খুলতে আর বন্ধ করতে হয়। বেচারার বেশীক্ষণ মুখ বন্ধ ক'রে থাকবার উপায় নেই,

তাই তাকে খাবারটা টপ্ ক'রে গিলে খেতেই হয়। গিলে না খেলে, মুখ খুললেই খাবার বেরিয়ে যায় মুখ থেকে।

জলের তলায় মাছেরা সহজেই বাস করে, অথচ আমরা বাস করতে পারি না কেন?

এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, স্থলচর জীবমাত্রেই বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকে। অথচ জলচর জীবেরা বেঁচে থাকে জল থেকে অক্সিজেন নিয়ে। এই অক্সিজেন নেবার জন্যেই শ্বাস-যন্ত্রের দরকার। মাছদের জল থেকে অক্সিজেন নিতে হয় ব'লে তাদের শ্বাস-যন্ত্রটা ঠিক স্থলচর জীবদের মত নয় এবং স্থলচর জীবের শ্বাস-যন্ত্রটা জলের থেকে অক্সিজেন নেবার মত ক'রে তৈরী নয়; কাজেই স্থলচর জীবমাত্রেই যেমন জলের তলায় ডুবে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না, তেমনি মাছেরাও ডাঙ্গায় উঠে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না। তবে কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি কোনও কোনও জাতের মাছ ডাঙ্গায় উঠে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে, এর কারণ তাদের দেহে—জলের তলা থেকে অক্সিজেন নেওয়ার ব্যবস্থাও যেমন আছে, তেমনি আবার ডাঙ্গায় উঠে অক্সিজেন নিয়ে খানিকক্ষণ বেঁচে থাকবার উপযোগী ফুসফুসও আছে। মাছের নাকের ছেঁদা আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা আমাদের মত নিশ্বাস নেয়না, এটাও জেনে রেখো।

চিংড়ীমাছের শরীরে শিরা, উপশিরা, হাড় ও রক্তের সন্ধান মেলে না, তবে ওরা কি ক'রে বাঁচে? চিংড়ীমাছের দেহ চালাবার যন্ত্রটি তার শরীরের কোন স্থানটীতে আছে?

বেঁচে থাকতে হ'লে শিরা, উপশিরা, হাড়, মাংস, রক্ত থাকা চাই-ই, এমন ধারণা তোমাদের হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু জেনে রেখো জীব-জগৎটা বিরাট এবং এই জীব-জগতে অণু পরমাণু থেকে সুরু ক'রে মানুষ পর্য্যন্ত কোটি কোটি রকমের জীব আছে এবং তাদের দেহ ও শরীরের গড়ন অনুযায়ী তারা

আলাদা আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করা। চিংড়ী মাছ অতি নিম্নস্তরের জীব, তারা যে শ্রেণীতে পড়ে তাদের বলা হয় 'আন্যালুসা' (Annalusa)। এই শ্রেণীর জীবদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এদের শরীর আঙটির মতো টুক্‌রো টুক্‌রো কতকগুলো অংশের সমষ্টিতেই তৈরী হয় এবং এদের দেহে রক্ত থাকে না। চিংড়ীমাছের শরীর চালাবার যন্ত্রটা আসলে থাকে তার মাথার খোলের ঐ অংশটার ভিতরেই—ঐখানেই আছে ওদের শ্বাসপ্রশ্বাস, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতির অন্যান্য যন্ত্র—ঐ অংশটিকে ইংরাজীতে বলে 'কারাপেস্' (Carapace)।

হাঁস বা পানকৌড়ীর পালখ জলে ভেজে না কেন?

হাঁস বা পানকৌড়ীর পালখ জলে ভেজে না তার কারণ এদের শরীরে ল্যাজের দিকে 'তৈলগ্রন্থি' ব'লে এক ধরণের 'গ্ল্যাণ্ড' আছে—সেখান থেকে চর্ব্বি বা তেলজাতীয় পদার্থ বার হয়ে পালখগুলিকে সব সময়ে তৈলাক্ত বা 'তেলা' ক'রে রাখে।

জোনাকী-পোকারা রাতে জ্বলে কেন?

জোনাকী পোকার গায়ে যে জিনিসটা আগুনের মত জ্বলে, ওটা মোটেই আগুন নয়, ওতে কোন তাপ নেই, জোনাকীর দেহের ভেতরে কয়েকটা প্রক্রিয়ার ফলে ঐ আভা দেখা যায়। দিনের আলোয় সেই আভা দেখা যায় না, অন্ধকারেই সেটা ফুটে ওঠে। তবে দিনের বেলাতেও ঘর অন্ধকার ক'রে যদি জোনাকী পোকা ছেড়ে দাও, তাহ'লেও আলো দেখতে পাবে।

মাছের পটকা কি কাজে লাগে?

এর জবাব, মাছের ঐ পটকার ভেতরে বায়ু বা গ্যাস ভর্ত্তি থাকাতেই মাছ জলে ভাসতে পারে। সব জাতের মাছের 'পটকা' বা 'বায়ুথলি' সমান নয়। যে সমস্ত জাতের মাছ গভীর জলে থাকে, তাদের পটকা খুব ছোট হয়, বা কোনও কোনও জাতের মাছের একদম পটকা থাকেই না। যে সব মাছের পটকা বড়, তারা খুব বেশী জলের নীচে যেতে পারে না।

সাপ-ব্যাঙ শীতকালে যখন গর্ত্তের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকে, তখন তারা কি খায় ?

তারা তখন কিছুই খায় না। কারণ, তখন তাদের খাবারের দরকারও হয় না। সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি কয়েকটা জীবের শীতকালে এই যে 'ঘুমন্ত' বা জড় অবস্থা, একে ইংরাজীতে বলে "Hibernation"। এই Hibernation-এর ব্যবস্থা আছে শুধু কতকগুলো 'ঠাণ্ডারক্ত-ওয়ালা' জীবের শরীরে ; অর্থাৎ তাদের রক্তের কোন স্থায়ী উত্তাপ নেই মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তুর মত। এই ঠাণ্ডারক্ত-ওয়ালা জীবজন্তুর রক্তের উত্তাপ বাইরের আবহাওয়ার উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ে কমে। কাজেই শীতে তারা আমাদের মত কাবু হ'য়ে যাতে না পড়ে, সেই ব্যবস্থায় শীতের সঙ্গে লড়াই কর্‌বার চেষ্টা না ক'রে দেহের সমস্ত কলকব্জা বন্ধ ক'রে রেখে শীতের হাতেই আত্মসমর্পণ করে। কাজ কর্‌লেই শরীরের ক্ষয় এবং সে ক্ষতি মেটাতেই আমাদের খাদ্যের দরকার। কাজেই Hibernation অবস্থাকে অনায়াসেই বলা চলতে পারে যে, না-খেয়ে বেঁচে থাক্‌বার সোজা উপায়। আমরাও যদি কাজ না ক'রে দিন রাত্তির ঘুমিয়ে থাকি তাহ'লে আমাদেরও খাবারের প্রয়োজনটা অনেক কম বোধ হয়।

কোন্ পাখীর ডিম সব চেয়ে বড় ?

বর্ত্তমান যুগে যত রকম পাখী দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে উটপাখীর ডিম সবচেয়ে বড়। কিন্তু যে সব পাখী লোপ পেয়েছে তার মধ্যে নিউ-জিল্যাণ্ডের মোয়াস (Moas) পাখীর ডিম, হতো এক ফুট লম্বা।

যে সমস্ত জীব ডিম পাড়ে, তারা এক সঙ্গে কতগুলি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে ?

অণ্ডজ প্রাণীরা ১ থেকে ৮০০০০০টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে এক সঙ্গে। সমস্ত জীবের ডিম পাড়ার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। মোটামুটি জেনে রেখো—হাঁস বা মুরগী ১টি ক'রে ডিম পাড়ে এক পক্ষকাল ধরে। কুমীর একসঙ্গে ১০

থেকে ১৫টি ডিম পাড়ে। সাপ ২০।২৫টি, কচ্ছপ ৫০টি, কড্‌মাছ এক একবারে ১০ লক্ষ ডিম পাড়ে। শামুক ৫০টি, উইপোকা একসঙ্গে ৮০০০০০ ডিম পাড়ে।

উট খাবার এবং জল না খেয়ে কি ক'রে অনেক দিন বাঁচে?

উট অনাহারে অনেক দিন থাকতে পারে এইজন্য যে, তার পিঠের ওপর যে কুঁজটি দেখো, সেটাতে থাকে একরকম চর্ব্বি জমানো, খাবারের অভাব যখন ঘটে, তখন তার ঐ কুঁজের চর্ব্বি তার শরীরকে পুষ্ট করে—ঐ কুঁজ থেকে খাবারের মতই শক্তি যুগিয়ে। পণ্ডিতরা দেখেছেন যে, উটকে অনেকদিন না খেতে দিয়ে রাখলে, তার কুঁজটি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে ও হেলে পড়ে, কেননা তখন তার চর্ব্বির ভাগটা কমতে থাকে।

আর উট জল না খেয়ে থাকতে পারে, তার কারণ হচ্ছে উটের পেটের মধ্যে তার পাকস্থলীর চারধারে জল জমিয়ে রাখার উপযোগী বহু থলি আছে, সে যখন জল খায়, তার তেষ্টা মেটাবার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু খেয়ে নিয়ে ঐ বাকিটুকু সেই সমস্ত থলিতে জমিয়ে রাখে এবং তাকে যখন জলহীন মরুভূমির মধ্যে চলতে হয়, তখন ঐ সমস্ত থলি থেকে জল টেনে নিয়ে শরীরই তার জলের অভাব মেটায়, কাজেই তেষ্টায় সে অধীর হয়ে ওঠে না আমাদের মতো।

মশা, মাছি ও ঝিঁঝিঁপোকা যে ডাকে, তার শব্দটা কি?

মশা মাছির ডাকটা আসলে তাদের ডাক বা মুখের শব্দ নয়, ওটা তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শব্দ। মশার ডানার নীচে একজোড়া ডাম্বেলের মত একরকম প্রত্যঙ্গ আছে, সেখানে মশার ডানার আঘাত লেগে ভন্ ভন্ শব্দের সৃষ্টি হয়। ঝিঁঝিঁপোকার ঝিঁ-ঝিঁ শব্দটা হয় তাদের পায়ে পা ঘসার শব্দ থেকেই, ঠিক যেমন বেহালাতে বেহালার ছড়ি ঘসলে শব্দ হয়, তেমনি কাণ্ডই ঘটে ওদের পায়ে পা ঘসা লেগে—আমরা তাই শুনি ঝিঁ-ঝিঁ শব্দের আকারে।

মৌমাছি মধু কোথায় পায় ?

মৌমাছি ফুল থেকে Nectar বা মধুরেণু সংগ্রহ করে তার লম্বা শিশি-বোতল-ধোওয়া বুরুশের মত জিভ দিয়ে, এবং তারপর ঐ জিভের শোষক নল-দিয়ে মুখে টেনে নেয় ঐ মধুরেণু,—সেখান থেকে তা যায় মৌমাছির পেটের ভেতরের মধুথলিতে, সেখানের অম্লরসের সংস্পর্শে এসে ঐ মধুরেণু বিশুদ্ধ মধুতে পরিণত হয়।

বিড়াল জল দেখলে ভয় পায় কেন ?

বিড়াল জল দেখলে ভয় পায় এইজন্য যে, অন্য জন্তুর মত তার দেহের লোমে তৈলাক্ত কোনও পদার্থ নেই অর্থাৎ সেটা জল-নিরোধক (water-proof) নয়। কাজেই অন্যান্য জন্তুর মত গায়ের জল তারা ঝেড়ে ফেলতে পারে না। জলে তারা ভিজে যায়, এই ভিজে যাওয়ার ফলে তাদের বড় শীত করে বা কষ্ট হয়। তাই তারা জল দেখলে ভয় পায়। শীতকালে যে কারণে তোমরা কন্‌কনে জলকে ভয় করো, অনেকটা সেই কারণেই বিড়াল জলকে ভয় করে।

কোন্ জীব চোখ না বুজেই ঘুমোয় ?

মাছ চোখ না বুজেই ঘুমোয়, কারণ তার চোখের ওপরে জীবজন্তু বা মানুষের চোখের মতো চোখের পাতা নেই। এই জন্যেই অনেকে বলেন—মাছ ঘুমোয় না।

কোন্ জীব ডাকতে পারে না ?

জিরাফের দেহটি দেখেছ তো কত বড়। কিন্তু জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, জিরাফ নাকি একেবারেই ডাকতে পারে না।

কোন্ জীবের দৃষ্টিশক্তি নেই ?

কেঁচো, উইপোকা এদের কোনটিরই দৃষ্টিশক্তি নেই।

কোন্ জীবের দৃষ্টিশক্তি সবচেয়ে বেশী ?

জীব-জগতে পাখীদের দৃষ্টিশক্তি অন্যান্য জীবের চেয়ে বেশী, কারণ পাখীদের চোখে ক্যামেরার ডায়াফ্রামের মত শক্ত রিং আছে দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য। ঈগল, প্যাঁচা, শকুন তাই বহুদূর থেকে দেখতে পায়।

কোন পাখী উড়তে পারে না ?

উটপাখী, এমু এবং কিউই পাখী উড়তে পারে না।

সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারে কোন্ জীব ?

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারে মাছি, মাছির গতির কাছে আর সবাই হার মানে। মাছি ঘণ্টায় ৫১০ থেকে ৬০০ মাইল বেগে যায়। পাখীদের মধ্যে বাজপাখী আর ঈগল সবচেয়ে দ্রুত যেতে পারে, তারা ঘণ্টায় ১৭০ থেকে ১৮০ মাইল পর্য্যন্ত যায়। স্থলচর জীবদের মধ্যে চিতাবাঘ সবচেয়ে দ্রুতগামী জীব, তারা ঘণ্টায় ৬০ মাইল যায়। আর মাছদের মধ্যে টান্নি মাছ যেতে পারে ৬০ মাইল বেগে।

জীব-জগতে কোন্ জীব সবচেয়ে বেশীদিন বাঁচে ?

সবচেয়ে বেশীদিন বাঁচে তিমি মাছ, এরা তিনশো বছরের বেশী বাঁচে, এছাড়া কাছপ, কুমীর, হাতী, এদেরও পরমায়ু কম নয়।

সবচেয়ে বড় আকারের পোকা-মাকড় কি ?

সবচেয়ে বড় আকারের পতঙ্গ হচ্ছে এরিবাস এগ্রিপ্পিনা (Arebas Agrippina)। এর ডানাশুদ্ধ মাপ হচ্ছে ১১ ইঞ্চি। আর ডানা বাদ দিয়ে সবচেয়ে বড় আকারের দেহ যদি ধরা হয়, তাহ'লে সবচেয়ে বড় পোকা—'ম্যাক্রোডন্টিয়া সারভিণ্টর্নিস' ব'লে গুব্‌রে জাতের পোকা। এটির দেহ লম্বায় ৬ ইঞ্চি মাপের হয়।

আকাশের রাজত্বের খবর

আকাশ কি ?

আকাশ হলো পৃথিবীর বাইরের শূন্যতা ; কিন্তু এই শূন্যতাই আবার বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা আছে। সমুদ্রের জলের সমতার (Sea-level) ঠিক ওপর থেকে সুরু হলো বায়ুস্তর অর্থাৎ বাতাসে ভর্ত্তি এই স্তর ; বায়ুস্তরের নীচের দিককে বলা হয় ট্রপোস্ফিয়ার' (Troposphere)। ওপরের স্তরকে বলা হয় 'স্ট্রাটোস্ফিয়ার' (Stratosphere)। এই স্ট্রাটোস্ফিয়ার আমাদের মাথার ১০ মাইল ওপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তার ওপরে ২০।২২ মাইল উঁচুতে ওজোনোস্ফিয়ার (Ozonosphere) এই বায়ুস্তরে আছে (Ozone) ওজোন গ্যাস, তার ওপরে হচ্ছে 'আয়োনোস্ফিয়ার' (Ionosphere) এখানে আছে বিদ্যুৎ-অণু।

চাঁদের ভেতরের চরকা-বুড়ী কে ?

চাঁদের ভেতর গাছের তলায় ব'সে বুড়ী চরকা কাটছে ব'লে যে জিনিসটা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছ, ওটা সত্যি সত্যি চাঁদের মা বুড়ী নয় ; ব্যাপারটা হচ্ছে পৃথিবীর মত চাঁদেও মেলাই পাহাড় পর্ব্বত, গর্ত্ত, খোন্দল এই সব আছে, তাই সব জায়গায় সমানভাবে সূর্য্যের আলো পড়ে না, আর 'তাই চাঁদের ঐ জায়গাগুলোতে আলোছায়ার সমাবেশে অদ্ভুত যত ছায়াছবির সৃষ্টি হয়।

সূর্য্য পশ্চিম দিকে না উঠে রোজই পূর্ব্ব দিকে ওঠে কেন ?

সূর্য্য পশ্চিমদিকে ওঠে না এইজন্য যে, পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডকে ভর ক'রে অহরহ পশ্চিম থেকে পূর্ব্ব দিকেই ঘুরছে।

সূর্য্যের আলোর এত উত্তাপ কেন ? সূর্য্যটা কত গরম ?

সূর্য্য হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড, চারধারে তার রয়েছে জলন্ত গ্যাস— এই গ্যাস ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে বলেই তাই আলো আর উত্তাপ পাই আমরা।

সূর্য্যের উপরিভাগের উত্তাপের মাপটা বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—ছ' হাজার সেণ্টিগ্রেড্।

রামধনু কি ?

আকাশে যে মেঘ থাকে, সেগুলোতে থাকে অসংখ্য জলবিন্দু—সেই জলবিন্দুগুলোর ভেতর দিয়ে সূর্য্যের আলো যখন সোজা যেতে যেতে ঠেক্ খেয়ে বেঁকে পৃথিবীতে পড়ে তখন তাকে বলে সূর্য্যরশ্মির বক্রণ বা 'রিফ্র্যাক্‌শন্' (Refraction) তখনই সূর্য্যের আলোয় লুকানো সাতটী রংকে আলাদা আলাদা ভাবে পৃথিবী থেকে দেখা যায়—এই যে রঙের সমাবেশ এটি হলো রামধনু। সময় সময় আলাদা আলাদা দুটি বিভিন্ন কোণে (angle) আলো বেঁকে পড়ার দরুণ দুটি রামধনুও দেখা যায়।

রামধনু অমন ধনুকের মত লাল হয় কেন ?

রামধনু যখন দেখা যায়, তখন সূর্য্য ৪৫° ডিগ্রী কোণে হেলে থাকে। ঐ অবস্থায় আলোক-রশ্মি বৃষ্টিকণায় প্রতিফলিত হয়ে যে ভাবে 'রিফ্র্যাক্টেড' (Refracted) হয় বা আলোকরেখার গতিপথ যেভাবে বেঁকে যায়, তাতে বৃষ্টিকণায় আলোর প্রতিফলন গোল হয়েই হয়। তাই রামধনু গোল দেখায়। সূর্য্য ৪৫° ডিগ্রী কোণে থাকলেই 'রামধনু' দেখা সম্ভব, তা নইলে হয় না।

যেখানেই যাও সূর্য্য আর চাঁদ সেখানেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে যায় কেন ?

সূর্য্যি মামা আর চাঁদা মামা ভাগ্‌নেদের ভালবাসেন বলেই ঐ কর্ম্মটি করেন, এটা যেন মনে করোনা! সূর্য্য আর চাঁদ—গোল পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যে রয়েছে বহুদূরে, কাজেই পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই তাদের দেখা যায় আর ব্যাপারটা তাই অমন মনে হয়।

সূর্য্যকে উদয় এবং অস্তের সময় লাল দেখায় কেন ?

তার কারণ তখন পৃথিবীর ওপরের বায়ুস্তর ভেদ ক'রে সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীতে সোজাসুজি পড়ে না। উদয় ও অস্তের সূর্য্য Horizon বা

দিক্‌চক্রবালের নীচে চলে যায় এবং তার ফলে বায়ুস্তরের উপরে সূর্য্যরশ্মির প্রতিফলন এমন একটা কোণ বা angle থেকে বাঁকা ভাবে হয়, যার ফলে সূর্য্য ওঠার সময় আমাদের চোখে সূর্য্যকে বড় দেখায়। পূর্ণিমার দিন চাঁদ যখন পূব দিকে ওঠে এই একই কারণে তাকেও মস্ত বড় দেখায়। সূর্য্যকে ওঠবার সময় লাল দেখায় এইজন্য যে, ঐভাবে সূর্য্য নীচে থাকায় তার নীল বা বেগুনে আলোকরশ্মি ছোট ছোট আলোক-তরঙ্গে গঠিত ব'লে তখন বাতাসের ধুলিজাল ও জলকণা ভেদ ক'রে ঐ পথে আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয় না; কিন্তু 'কমলা' ও লাল রঙের আলোক-রশ্মিগুলো দীর্ঘ আলোক-তরঙ্গে গঠিত বলেই সেগুলো বায়ুমণ্ডলের নীচের গভীর স্তর ভেদ ক'রে চোখে পড়ে, তাই তখন সূর্য্যকে লাল দেখায়। আকাশে ধুলো থাকলে ঐ সময়ে নানারকম রঙ-এর খেলাও ঐ কারণে দেখা যায়।

মঙ্গলগ্রহে লোক আছে নাকি?

মঙ্গলগ্রহে লোক আছে কিনা বলা যায় না, সেখানে হয়ত অন্য কোনও ধরণের জীব আছে, এটা বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই আন্দাজ করেন, তবে এখনও তা যথারীতি প্রমাণিত হয়নি।

আকাশ নীল দেখায় কেন?

আকাশ নীল দেখায়—কারণ, সূর্য্যরশ্মি বায়ুস্তর ভেদ ক'রে পৃথিবীতে আসে, কিন্তু সূর্য্যরশ্মি এই বায়ুস্তর ভেদ করার আগেই, বায়ুস্তর তার ওপরের হাইড্রোজেন গ্যাস এবং তড়িৎঅণু (Electron) মেশানো সূর্য্যরশ্মি থেকে খানিকটা নীল রংয়ের আলো শুষে নিয়ে পৃথিবীর চারধারে ছড়িয়ে দেয়, তাই আকাশ নীল দেখায়। কেউ কেউ বলেন সূর্য্যের আলো হাওয়ার ভেতর দিয়ে আসবার সময় হাওয়ায় ভাসমান অসংখ্য ধূলিকণা ও অণুতে ঘা খেয়ে ছোট ছোট আলোক-তরঙ্গ থেকেই নীল আলোর উৎপত্তি হয়, কাজেই আকাশ অমন নীল। সূর্য্যরশ্মির ভেতর সাতটা রঙ লুকানো আছে তা বোধহয় তোমরা জানো এবং এই সাতটা রংএর সৃষ্টি হয় ছোট বড় বিভিন্ন মাপের আলোক-তরঙ্গ থেকেই।

চন্দ্র ও সূর্য্যের চারিদিকে সময় সময় গোলাকার যে চিহ্ন পড়ে সেটা চন্দ্র-সূর্য্যের সভা কিনা—আর অমন দেখায় কেন?

চন্দ্র সূর্য্যের চারধারে ঐ যে গোল আলোর বেড় সময় সময় দেখা যায়, ওকে আমাদের দেশে চন্দ্র সূর্য্যের সভাই বলা হয় বটে, তবে ইংরাজীতে ওকে বলা হয় হ্যালো (Halo)। বায়ুমণ্ডলীর খুব উপরের স্তরের জলকণা বা তুষারকণায় সূর্য্য বা চন্দ্রের আলো প্রতিফলিত হয়েই ওই জিনিসটার সৃষ্টি হয়—ঠিক যেমন ক'রে বায়ুমণ্ডলীর জলকণাপূর্ণ স্তরে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হ'য়ে রামধনুর সৃষ্টি করে।

দিনের বেলায় আমরা তারা দেখতে পাই না কেন?

এর কারণ দিনের বেলায় প্রখর সূর্য্যরশ্মি আমাদের চারপাশের বায়ুমণ্ডলীতে ছড়িয়ে থাকে। সেই আলো ভেদ ক'রে বহুদূরের তারার মৃদু আলো তখন আমাদের চোখে প্রতিফলিত হ'তে পারে না,—তাই আমরা দিনের বেলায় তারা দেখতে পাই না। তবে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্য ঢাকা প'ড়ে যখন চারধার অন্ধকার হ'য়ে পড়ে, তখন দিনের বেলাতেও সময় সময় তারা দেখা যায়। কাজেই তারারা রাতেও যেখানে থাকে দিনেও ঠিক সেইখানে থাকে।

আকাশে কত তারা আছে?

সেটা বলা বড়ই শক্ত। কারণ কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে মহাশূন্যে। তবে বিজ্ঞানীরা গুণে ব'লেছেন, পৃথিবীর ওপর থেকে শুধু চোখে যে ক'টি তারা দেখা যায় তার সংখ্যা হচ্ছে ৭,৬৪৭, সাত হাজার ছ'শো সাতচল্লিশ। কাজেই তুমি অনায়াসে অন্ধকার রাত্তিরে গোটা আকাশটার দিকে তাকিয়ে নির্ভুলভাবে ব'লতে পার—"আমি তিন হাজারের কিছু বেশী তারা দেখতে পাচ্ছি।" আর পৃথিবীর ওপিঠের লোকগুলো দেখছে বাকী সব তারা। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা?

চাঁদের নিজস্ব কোন উত্তাপ আছে কি?

চাঁদের নিজস্ব কোন তাপ নেই, তবে সূর্য্যের তাপে সে গরম হয়ে ওঠে। আবার চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী যখন সূর্য্যের আলোর পথ বন্ধ ক'রে দাঁড়ায় তখন সে হয় ঠাণ্ডা।

সূর্য্যের আলোয় সাতটা রং লুকানো আছে নাকি?

সূর্য্যের কিরণে যে সাতটা রং আছে তা সহজেই যদি বুঝতে চাও তাহ'লে পুরানো ঝাড় লণ্ঠনের একটা তেশিরে বা তিন-কোণা কাচ যোগাড় ক'রে তার ভেতর দিয়ে রোদ্দুরটাকে দেখ। নয়তো আর এক কাজ করতে পার, এক মুখ জল নিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে খুব জোরে ফু ক'রে ছুঁড়ে দেবে, দেখবে তাতেও সাতটা রং। কারণ সূর্য্যের আলোর সাতটা রং তখন ঐ জলকণায় প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে প্রতিফলিত হয়।

মেঘ করলে গরম আর গুমোট হয় কেন?

মেঘ করলে গরম আর গুমোট হয় এই জন্য যে মেঘেরা বাতাসের পথ আটকে ঘোরাফেরা করে আকাশে। তাতেই আমাদের চারিপাশের বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে। কাজে কাজেই পৃথিবীর ভেতর থেকে সবসময়েই যে উত্তাপ আসছে, সেটাও মেঘের চাপ ভেদ ক'রে ওপর দিকে যেতে না পেরে আমাদের চারপাশের আবহাওয়াকে গরম ক'রে তোলে।

পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময় রাত্রের মত অন্ধকার হয় না কেন?

আসলে চন্দ্রগ্রহণে ও সূর্য্যগ্রহণে অনেকটা তফাৎ। চন্দ্রগ্রহণ হয় তখনই, যখন পৃথিবীটা, চন্দ্র আর সূর্য্যের মাঝপথে সোজাসুজি এসে দাঁড়ায় এবং পৃথিবীর কালো ছায়াটা চাঁদে এসে পড়ে বলেই চাঁদকে কালো দেখায়; কিন্তু পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ যখন হয়, তখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে সোজাসুজি এসে পড়ে চাঁদ এবং সূর্য্যগ্রহণের সময় যে কালো জিনিসটি দেখতে পাও সেটা চাঁদই, সূর্য্যের ওপর চাঁদের ছায়া নয়। সূর্য্যের আলো পেছনে থাকার ফলেই

চাঁদটাকে অমন কালো দেখায় এবং এইজন্য রাত্রের মত অন্ধকার হয় না। তার পাশ থেকে যেটুকু সূর্য্যরশ্মি আকাশে ছড়ায় তারই আলোতে অমন কালো মেঘলা দেখায়।

মেঘেরা আকাশে নড়ে চড়ে কেমন ক'রে? অমন ক্ষণে ক্ষণে চেহারা বদলায় কেমন ক'রে?

মেঘটা আসলে হচ্ছে কোটী কোটী হাল্কা জলকণা, ধোঁয়া, ধুলো ও তুষার-কণার সমষ্টি—হাওয়ার চেয়ে হাল্কা বলেই বাতাসে ভর ক'রে ওরা অমনি আকাশে ভেসে বেড়ায়। আর বাতাসের চাপ লেগেই মেঘ চেহারা বদলে বদলে কখনও হাতী, কখনও উট, কখনও পাহাড়, কখনও বা গাছের মতই রূপ ধরে।

চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রের মধ্যে প্রভেদ কি?

প্রথমে বলি সূর্য্য ও নক্ষত্রের মধ্যে বড় বিশেষ তফাৎ নেই, কারণ নক্ষত্র গুলো আসলে সূর্য্যের মতই জ্বলন্ত গ্যাসের গোলা এবং ছোট খাটো এক একটি সূর্য্য, তবে তারা অনেক দূরে থাকে বলেই অত ছোট দেখায়। কাজেই নক্ষত্র কারুর কাছ থেকে আলো ধার করে না—আলোটা তাদের নিজস্ব। তবে গ্রহগুলোর নিজস্ব কোন আলো নাই। তাদের দেহে সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত হওয়ার ফলেই অমন জ্বলজ্বলে দেখায়। চন্দ্র কিন্তু গ্রহও নয়, নক্ষত্রও নয়—একে বলা হয় 'উপগ্রহ'; কারণ পৃথিবীর চারপাশে চন্দ্র ঘুরছে, এরকম বহু উপগ্রহ বিভিন্ন গ্রহের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সূর্য্য বড় না পৃথিবী বড়?

পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্য অনেক অনেক বড়, কত বড়ো জানো? পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ বড়। অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৩০ হাজার পৃথিবী এক করলে তবে একটি সূর্য্যের সমান হবে। অমন দূরে আছে ব'লে অত ছোট দেখায়।

পৃথিবী থেকে চাঁদ কত দূরে আছে? চাঁদের মাপ কত?

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের কোন বাঁধা-ধরা মাপ পাওয়া সম্ভব নয়।

কারণ, চাঁদ পৃথিবীর চারধারে যে পথে ঘুরছে সেটা ঠিক গোল নয়, কাজেই চাঁদের গড়পড়তায় দূরত্বের মাপ হচ্ছে পৃথিবীর থেকে ২৩৮৮৪০ মাইল। চাঁদটা মাপে হচ্ছে মোট ১৪৬৮৫০০০ বর্গ মাইল।

চাঁদে যে বাতাস আর জল নেই তার প্রমাণ কি?

প্যারিসের মিউডেন অবজারভেটারীর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, চাঁদের আলোটা বাস্তবিক পক্ষে ঠিক ঐ আগ্নেয়গিরির ছাই চাপা আগুন থেকে যে ধরণের আলো প্রতিফলিত হয়, সেই ধরণেরই আলো। সেইজন্য বৈজ্ঞানিকেরা এইটাই সম্ভব ব'লে ধরে নিয়েছেন যে, চাঁদ আগাগোড়া জ্বলন্ত আগুনের ওপর ছাই দিয়ে ঢাকা। যদি সেখানে হাওয়া থাকত তাহ'লে ঐ ভাবে ফাঁকা ছাই দিয়ে আগুন ঢাকা সম্ভব হ'ত না কখনই, বা ঐ ভাবে আগুন নিভে নিভে ছাইও হয়ে যেত না। হাওয়ায় ছাই উড়ে গিয়ে আগুনই দেখা যেত। কাজেই সেখানে হাওয়া নেই, অতএব জলও নেই।

উল্কা জিনিসটা কি?

অনেকের ধারণা উল্কা হচ্ছে ছোট ছোট তারা, কিন্তু তা মোটেই নয়। উল্কা বললে বুঝতে হবে—কতকগুলো ধাতু ও প্রস্তরের মতো শক্ত পদার্থ যা তারার মতই সীমাহীন আকাশে ঘুরে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে তারা কখনও কখনও পৃথিবীর চারধারের বায়ুস্তরের মধ্যে এসে পড়ে। পৃথিবীর বাইরের এই বায়ুস্তরও ঠিক পৃথিবীর মতই সচল এবং সেইজন্যই উল্কাগুলো এই স্তরের সংস্রবে এসে পড়লেই তার সঙ্গে ঠোকাঠুকি খেয়ে দেশলাইয়ের কাঠির মত দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে এবং শেষ পর্য্যন্ত পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। বছরের পর বছর ধ'রে এই রকম কত লক্ষ লক্ষ উল্কা পৃথিবীর বায়ুস্তরের টানে পুড়ে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। খুব বড় ধরণের উল্কা হ'লে সমস্তটা পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পৃথিবীর এলাকায় এসে পড়ে এবং তার আগুন নিভে গিয়ে বাকী অংশটুকু শক্ত একটা পিণ্ডের মত পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ে।

'পূর্ণগ্রাস' ও 'আংশিক গ্রাস' গ্রহণে তফাৎ কি ?

আংশিক গ্রহণ আর পূর্ণগ্রাস গ্রহণ কি ক'রে হয় ? এই জটিল প্রশ্নের জবাবটা আগে দিই। তোমরা তো মনে করতে পার যে, প্রত্যেক মাসেই একটা ক'রে চন্দ্রগ্রহণ আর একটা ক'রে সূর্য্যগ্রহণ হওয়া সম্ভব ; কিন্তু তা' হয় না, গ্রহণ মাঝে মাঝে হয়। এর কারণ কি ? ব্যাপারটা হচ্ছে, চাঁদ যে-পথে পৃথিবীর চারধারে ঘুর্‌ছে, সেই পথ বা Orbitটা—পৃথিবী যে-পথে সূর্য্যের চার্‌ধারে ঘুর্‌ছে, সেই পথ বা Ecliptic-এর সঙ্গে কোণাকুণি ভাবে রয়েছে ; চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হওয়া-না-হওয়াটা নির্ভর করে ওই Orbit আর Ecliptic যে-জায়গায় দুটো দুটোকে পরস্পর কাটাকুটি করে, সে-জায়গাটা থেকে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার চাঁদের দূরত্বের ওপর। Orbit আর Ecliptic যে জায়গায় পরস্পরকে কাটাকুটি করে, তাকে বলা হয় Node। যখন পূর্ণিমার চাঁদ এই Node অথবা দুটো পথ যেখানে কাটাকুটি করেছে, সেখানে আসে—তখনই পৃথিবীর কালো ছায়ায় সেটা আগাগোড়া ঢাকা প'ড়ে যায়। তাকেই বলি পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। কিন্তু যখন চাঁদ Eclipticএর অনেক ওপরে, পৃথিবার ছায়াটার বাইরে ওই Node থেকে অনেক দূরে থাকে, তখন কোনও গ্রহণ সম্ভব হয় না ; কারণ, তা'তে ছায়া পড়ে না। তবে যখন চাঁদ Ecliptic থেকে অতটা ওপরে না থেকে পৃথিবীর ছায়ার এলাকায় খানিকটা এসে পড়ে, তখন চাঁদের যে অংশটুকু ওই ছায়ার এলাকায় এসে পড়ে ততটুকুই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে এবং তাকেই বলে, আংশিক চন্দ্রগ্রহণ। সূর্য্যগ্রহণ থেকে চন্দ্রগ্রহণ বেশীবার হয়, এ-কথাটা সব সময় খাটে না। জায়গা-বিশেষে সময় সময় বছরে চন্দ্রগ্রহণ যতবার হয়, তার চেয়ে বেশীবার হয় সূর্য্যগ্রহণ। কাজেই ওটার কোনো বাঁধা-ধরা কারণ দেখান যেতে পারে না। তবে এই দুটো নিয়ম মনে রাখতে পারো যে, বছরে সাতটার বেশী গ্রহণ হতে পারে না, পাঁচটা সূর্য্যগ্রহণ দুটো চন্দ্রগ্রহণ, বা চারটি সূর্য্যগ্রহণ, তিনটি চন্দ্রগ্রহণ। (২) বছরে কমপক্ষে দুবার সূর্য্যগ্রহণ হবেই, তবে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দেখা না-ও যেতে পারে।

সমুদ্রের ধারের দেশে সাধারণতঃ বৃষ্টি বেশী হয়; কিন্তু সমুদ্রের ধারে থেকেও কতকগুলো দেশ মরুভূমি এর কারণ কি?

সমুদ্রের ধারে থেকেও সে-দেশগুলো মরুভূমি হয়েছে এইজন্যে যে, এই জায়গাগুলোর ওপর দিয়েই Trade wind বা 'গরম ঝড়' অনবরত আসা-যাওয়া করে। ফলে, ওই সব দেশের মাটি তো শুকিয়ে যায়ই, উপরন্তু ঐ ঝড় এলোমেলো ভাবে না ব'য়ে এক পথ ধ'রে একই ভাবে আসা-যাওয়া ক'রে যত রাজ্যের বালি ব'য়ে এনে ফেলে সেখানে। প্রাচীনকালে এই বাতাসে ভর ক'রে পালতোলা জাহাজে ক'রে ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্য আনানেওয়া হতো ব'লে ঐ 'ঝড়ো-হাওয়া'কে Trade wind বলে। মরুভূমির মাটি গরম হাওয়ায় বা ঐ ভাবে শুকিয়ে সব সময়ে গরম হ'য়ে থাকার ফলেই তার ওপরের বায়ুস্তরেও গরম থাকে, কাজেই, সেখানে বৃষ্টি মাটিতে পৌছবার আগেই তা' ওপরের বায়ুস্তর শুষে নেয়, সে কথা তো আগেই বলেছি।

পৃথিবী থেকে সব কাছে কোন্ নক্ষত্র ও কোন্ গ্রহ?

'আল্ফা সেণ্টরী' (Alpha Centauri) এই নক্ষত্রটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আছে—এটিকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধেই দেখা যায়। কত কাছে জানো? ২৫০ লক্ষ মাইলের পিছনে আরও সাতটা শূন্য বসালে যত হয় তত মাইল দূরে। এই নক্ষত্রটির তুলনায় সূর্য্য আমাদের বেশ কাছেই আছে বলা চলে, কারণ, পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব মোটে এই ৯২ কোটি থেকে ৯৫ কোটি মাইলের মধ্যে। বৈজ্ঞানিকেরা কি ক'রে এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহের দূরত্ব মেপে ঠিক করেন, সেটাও মোটামুটি জেনে রাখো। নিচলসেন ব'লে এক বৈজ্ঞানিক 'ইণ্টারফেরোমিটার' ব'লে এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন, এই যন্ত্রের সাহায্যেই আলোর গতি মেপে গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব ঠিক করা হয়। সব কাছে যে গ্রহটি আছে সেটি নতুন আবিষ্কৃত গ্রহ, নাম তার 1239 H. A., এটি নাকি পৃথিবী থেকে চার মাইল দূরে আছে। এটি আবিষ্কার করেছেন ডক্টর কার্ল রেইনমুথ।

নদীতে বান দেখা যায় কেন ?

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নদী এবং সমুদ্রে বান দেখা যায়। 'বান' আসলে জোয়ার-ভাঁটারই রূপান্তর। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল ফোলে ও কমে এবং তাই নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে এ-কথা নিশ্চয়ই ভূগোলে পড়েছ। কিন্তু এই সাধারণ জোয়ার-ভাঁটা যখন ঘটে, তখন সূর্য্যের টানের উল্টো দিকেই থাকে চন্দ্রের টানের গতি। কিন্তু কখনও কখনও সূর্য্য আর চন্দ্র এক হয়ে একই দিকে টানে জলকে। তখনই নদীর জল ভয়ানক ভাবে ফুলে ওঠে এবং এই জল ফুলে ওঠার ব্যাপারটাকেই আমরা বলি "বান-ডাকা।" মোটামুটি ব্যাপারটা হ'ল এই। সব নদীতে বান ডাকে না, তার কারণ, এই 'বান-ডাকাটা' নির্ভর করে নদীর গভীরতার আর নদীতলের সমতার ওপর।

তারা মিট্ মিট্ করে কেন ?

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—তারার আলোক-তরঙ্গ বা Light-Wave-এ আমাদের চারপাশের বাতাসের ঢেউএর কাঁপন লাগার ফলেই তারার আলো আমাদের চোখে ঐভাবে কেঁপে কেঁপে প্রতিফলিত হয়,—আর তাই মনে হয়, তারারা জ্বল্ছে আর নিভ্ছে।

সূর্য্যের চারিধারে বেড় দিয়ে কত বেগে পৃথিবী ঘুরে আসছে ?

পৃথিবী একদিনে ১৬০০০০০ মাইল ঘুরে আসে। মিনিটে ১১০০ মাইল আর প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে আঠার মাইল বেগে—এই পৃথিবী সূর্য্যকে বেড় দিয়ে ঘুরছে। সূর্য্যকে বেড় দিয়ে এভাবে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর একটি বছর লাগে।

পৃথিবী ঘুরছে অথচ আমরা ছিটকে পড়ে যাই না কেন ?

খুব সোজা কথায় এর জবাব হচ্ছে,—পৃথিবীর 'মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি' মানুষ, জন্তু, ঘর-বাড়ী ও এই পৃথিবীর সব কিছু জিনিসকেই তার কেন্দ্রের দিকে টেনে রেখেছে এবং সেই টান পৃথিবীর ঐ 'ঘুরিয়ে ফেলার গতি বা বেগ'

(Centrifugal force) এর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। তাছাড়া, পৃথিবীর এই 'ঘুরিয়ে ফেলার গতি' বা Centrifugal force আর 'মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি'র একটা সমতা সব সময়েই বজায় আছে এবং পৃথিবী একতালে একই ভাবে ঘুরছে, যার ফলে আমরা ছিট্‌কে পড়ি না ; তবে যদি পৃথিবীটা কোনও দিন একটু বেশী জোরে ঘুরে ওঠে বা ঘোরার বেগটা একটু কমিয়ে ফেলে তা' হ'লে আমরা যে মহাশূন্যে ছিট্‌কে পড়বো, তাতে সন্দেহ নেই।

পৃথিবীটার ওজন কত ?

পৃথিবীর ওজন সব প্রথম বার করেন হেন্‌রী ক্যাভেণ্ডিস্। কিন্তু পৃথিবীর ওজন নতুন ক'রে যিনি আবিষ্কার করেছেন, তাঁর নাম ডক্টর পল-আর-হেল্ —তাঁর হিসাবে পৃথিবীর ওজন হচ্ছে ৫৯৯৭ এই চারটি সংখ্যার পর ১৮টি শূন্য বসালে যত হয় তত টন।

ধূমকেতু কি ?

সূর্য্যকে বেড় দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র যেমন সুনির্দ্দিষ্ট পথ ধরে ঘুরছে—তেমনি এক ধরণের জ্যোতিষ্কও সূর্য্যের চারধারে ঘুরছে। এই সব জ্যোতিষ্ককে দেখলে মনে হয় ধোঁয়ায় ঘেরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাই এদের নাম ধূম-কেতু। আর মনে হয় আলোকরেখায় গড়া এদের একটা ক'রে লেজও আছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি এক একটি অগঠিত তারা। 'ধূমকেতু' বিভিন্ন রকমের আছে এবং এদের চলার গতি ও গতিপথের মাপ বিভিন্ন। তাই বিভিন্ন 'ধূমকেতু' পৃথিবীর লোকের দৃষ্টিপথে আসে তাদের ঘোরার গতি ও গতি-পথের হিসাব অনুযায়ী—বিভিন্ন সময়ে। মোটামুটি এই সব ধূমকেতু সওয়া তিন বছর থেকে ৮০ বছর অন্তর এক একবার দেখা দেয়। কোনও কোনও 'ধূমকেতু'র দেখা হয়তো লক্ষ বছরে একবার পাওয়া যায়, এমন কথাও জ্যোতিষীরা বলেন। হেলির ধূমকেতু (Halley's comet) ৭৬ বছর অন্তর দেখা দেয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 'হেলি' (Halley) এই ধূমকেতু আবিষ্কার করেন—তিনিই হিসাব ক'রে বলেছিলেন 'ধূমকেতু' ৭৬ বছর অন্তর দেখা দেবে।

'নীহারিকা' কি ?

অন্ধকার রাত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকলে ধোঁয়ার মত জ্যোতিষ্ক দেখা যায় আকাশের গায়ে—তারই সাধারণ নাম নীহারিকা (Nebula), কিন্তু এ ধরণের সবগুলিই যে আসল নীহারিকা তা নয়। অনেক সময় ছোট ছোট তারার গুচ্ছকেও আমরা নীহারিকা ব'লে ভুল করি। আসল 'নীহারিকা'-গুলোকে দূরবীণ দিয়ে দেখলেও বাষ্পের আকারেই দেখা যায়। 'নীহারিকা' মাত্রেই হাল্কা গ্যাসে গড়া আলোকপুঞ্জ। জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা একাধিক নীহারিকা আবিষ্কার করেছেন।

পাতালের রাজত্বের খবর

পাতাল কি ?

হিন্দুদের মতে ত্রিলোক আছে—যথা, স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল। আকাশকে বলা হয় স্বর্গ। মর্ত্ত্য এই পৃথিবীটা, আর পাতাল হলো মাটির নীচে। পুরাণের মতে পাতাল সাতটা, যথা—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। যাক সে কথা, আধুনিক মতে পৃথিবীর গোটা দেহটা ধরতে হলে—মাটির উপরের বায়ুস্তরকে বাদ দিলে চলে না। এবং পৃথিবীটা মোটামুটি ছ'টা এই রকম স্তরে ভাগ করা। প্রথমেই হলো বায়ুস্তর বা 'এ্যাট্‌মস্ফিয়ার' (Atmosphere), তারপর হলো 'জলস্তর' বা 'হাইড্রোস্ফিয়ার' (Hydrosphere), তারপর 'অশ্মস্তর' বা 'লিথোস্ফিয়ার' (Lithosphere), তারপর আছে 'খনিজস্তর'—এর নীচেই সব চেয়ে ব্যাপক এক স্তর—তাকে বলা হয় 'গুরুস্তর' বা 'ব্যারিস্ফিয়ার' (Barysphere) এর নীচেই পৃথিবীর 'কেন্দ্রস্তর' (Centrosphere)—এই কেন্দ্রস্তরটি বৈজ্ঞানিকদের মতে গ্যাস অথবা জ্বলন্ত গলিত পদার্থে গড়া। 'পাতাল' বলতে আসলে বোঝায় ঐ লিথোস্ফিয়ার বা অশ্মস্তরের নীচের স্তরগুলি। 'লিথোস্ফিয়ার'-এর উপরে আছে, সমুদ্র, সাগর, হ্রদ, মাঠ, বন, পাহাড়-পর্ব্বত। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ মাটির নীচে ও জলের নীচেটাকেও পাতাল ব'লে থাকি।

পাতাল রাজত্ব কোথায় ও সেখানে পাতালে কি আছে? পাতালের গভীর রাজত্ব বলতে তাহ'লে বোঝাচ্ছে তিনটি স্তর—প্রথমে হচ্ছে 'খনিজ-স্তর' (Ore zone) এই স্তর গঠিত হয়েছে মাটি আর খনিজ পদার্থ এক সঙ্গে মিশিয়ে। এর নীচেই যে 'গুরুস্তর' বা ব্যারিস্ফিয়ার—সেই স্তরটি গঠিত হয়েছে লোহা ও নিকেল দিয়ে এবং সেইটিই পৃথিবীর সবচেয়ে মজবুত স্তর। তার জোরেই গোল পৃথিবী আমাদের সকলের ও ঘরবাড়ী, পাহাড় পর্ব্বতের ভার বইতে পারছে। এই স্তরের নীচেই আছে জ্বলন্ত গলিত পদার্থে গড়া 'কেন্দ্রস্তর' বা Centrosphere। এই জলন্ত গলিত পদার্থই মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে পাহাড়-পর্ব্বত ভেদ ক'রে—আগ্নেয়গিরির ভেতর দিয়ে—একেই বলি আমরা অগ্ন্যুৎপাত।

জল ও মাটির নীচে কতদূর পর্য্যন্ত মানুষ সন্ধান পেয়েছে?

সাবমেরিণ চলেছে ৩৮৪ ফুট জলের নীচে দিয়ে, ডুবুরী নেমেছে ৮১৪ ফুট জলের নীচ পর্য্যন্ত। জলের নীচে 'ব্যারিস্ফিয়ার' বা 'জলগোলক' নামানো হয়েছে দেড় মাইল গভীরতা পর্য্যন্ত। মাটির নীচে মানুষ খনি খুঁড়েছে ৮০০০ ফুট পর্য্যন্ত—তেলের খনি পৌছেছে ১০০০০ ফুট গভীরতা পর্য্যন্ত। আর সমুদ্রের গভীরতার মাপ করেছে মানুষ যন্ত্রের সাহায্যে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুটের বেশী পর্য্যন্ত।

সুড়ঙ্গপথগুলো কি পাতালে যাবার রাস্তা?

না তা নয়। এগুলো দিয়ে পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর বুকেই যাতায়াত করে। তবে মাটির নীচে ও জলের নীচে ঐ পথগুলো তৈরী হয়েছে ব'লে—ওকে লোকে সাধারণতঃ বলে পাতালের পথ। এমনি ধারা সুড়ঙ্গ পথ তিনটি আছে আল্পস্ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। একটি ৮ মাইল লম্বা—নাম তার 'মণ্ট্ সেলিস্ সুড়ঙ্গ'—আরও একটা সুড়ঙ্গ আছে আল্পস্ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে সেটা সওয়া নয় মাইল লম্বা—নাম তার 'সেণ্ট গটার্ড' সুড়ঙ্গ। আর বাকিটি হচ্ছে—'সিম্পলন্' সুড়ঙ্গ—এটি সওয়াবারো মাইল লম্বা—পৃথিবীর মধ্যে

এইটি হলো সব চেয়ে লম্বা সুড়ঙ্গ। জলের নীচ দিয়ে বিভিন্ন সুড়ঙ্গপথ বা টানেল আছে টেমস্ নদীর নীচে। লণ্ডন সহরের মাটির নীচে বহু সুড়ঙ্গপথ আছে—সেই সব সুড়ঙ্গ পথে 'টিউব রেলওয়ে' আছে।

পাতালের জীব কারা? তারা কেমন ক'রে, কি খেয়ে বাঁচে?

সমুদ্রের গভীর জলের নীচে যে সমস্ত মাছ, পোকা-মাকড়, কীট, জলজন্তু থাকে তাদেরই আমরা সাধারণতঃ ব'লে থাকি পাতালপুরীর বাসিন্দা। কিন্তু সমুদ্রের জলের গভীরতাটাও বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন জাতের জীবরা ঘুরে বেড়ায়, এটা জীবতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন। শুধু কি তাই? সমুদ্রের জলের তলায় হাজার হাজার মাইল নীচে ঐ লোণা জলেই বেড়ে উঠছে সামুদ্রিক গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল—ঠিক পৃথিবীর মাটিতে যেমন আমরা দেখতে পাই। মাটির ওপরে চারপাশের গাছ পাহাড় থেকে আমরা যেমন খাদ্য সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকি, সমুদ্রের তলার কোটি কোটি জীবও নিজের নিজের রুচি অনুসারে অমনি ঐ সব গাছপালা বা জলজ কীট-পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ার খেয়ে বেঁচে আছে। সমুদ্রের তলায় ডুবুরীরা নেমে দেখে এসেছে সে এক মজার রহস্যপুরী, কত রং বেরঙের মাছ—কত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জানোয়ার—যা হয়তো আমরা কোনওদিনই কেউ দেখতে পাব না।

সমুদ্রের তলা দিয়ে টেলিগ্রাফের তার কি ভাবে নেওয়া হয়?

এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে টেলিগ্রাফের যে তার জলের ভেতর দিয়ে নেওয়া হয়েছে, তার ভেতর টেলিগ্রাফের শব্দ কি ক'রে শোনা সম্ভব, কারণ জলের তলায় তো বাতাস নেই? উত্তরটা খুব সোজা। টেলিগ্রাফের তারের মারফৎ আমরা যে শব্দ শুনতে পাই, তার সঙ্গে বাতাসের কোন সম্পর্ক নেই, তার কারণ টেলিগ্রাফের ব্যাপারে শব্দ-তরঙ্গকে (Sound waves) বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বদলে ফেলে তারের মারফৎ পাঠানো হয়। অর্থাৎ তারের ভেতর দিয়ে শব্দ যায় না, যায় শব্দের নূতন রূপ, ঐ ইলেক্‌ট্রিক-কারেণ্ট। যখন শোনবার দরকার হয় সেটা, সেখানে আবার বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শব্দতরঙ্গে

বদলে নেওয়া হয়, এই ভাবেই কাজ চলে। তবে সমুদ্রের তলার জল ও আরও নানারকম বাধা বিপত্তি থাকে বলেই সমুদ্রের তলা দিয়ে যে টেলিগ্রাফের তার নেওয়া হয়, সেটা সাধারণ টেলিগ্রাফের তারের চেয়ে ঢের বেশী মজবুত এবং সম্পূর্ণ আলাদা উপায়ে তৈরী—সেটা তৈরী হয় এইভাবে, প্রথমে থাকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যাবার তামার তার, তার ওপর থাকে নিকেল লোহা আর তামা সব মিশিয়ে-তৈরী ধাতুর পাঁচ পর্দা ফিতে জড়ানো, তার ওপর থাকে গাটাপার্চ্চার পর্দা, এই গাটাপার্চ্চার পর্দার ওপর আবার এক পুরু মশলা মেশানো পাট জড়ানো হয়, তারপর তাকে আবার গ্যাল্ভানাইজড্ চাদর আর ইস্পাতের তার দিয়ে মোড়া হয়। সব শেষে রবার মেশানো পাট দিয়ে সেটাকে ঢাকা হয়। এই হলো জলের তলার টেলিগ্রাফের তার যাকে বলা হয় 'কেব্‌ল্' (Cable)। এই 'কেব্‌ল্' সমুদ্রের তলায় পাতবার জন্যে একরকমের আলাদা ধরণের জাহাজ আছে—তাকে বলা হয়, কেব্‌ল্ লেয়ার্স (Cable layers)। সমুদ্রের তলায় এই 'কেব্‌ল্-তার' দেড় হাজার ফুট গভীরতা থেকে ১২।১৩ হাজার ফুট গভীরতার মধ্যে পাতা থাকে।

পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে কোন্ কোন্ দেশে কী কী করা হয়েছে?

ফ্রান্সে ২৭৬৫ ফুট খুঁড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর কুয়া 'আর্তেজীয় কূপ' তৈরী হয়েছে। বেলজিয়ামে ৪০০০ ফুট খুঁড়ে তৈরী হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর কয়লার খাদ। পৃথিবীর বুক—৮০০০ ফুট খুঁড়ে 'মোরা বেলহো' ব'লে পৃথিবীর গভীরতম সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে 'ব্রেজিল' দেশের লোকেরা। ক্যালিফোর্ণিয়াতে ১০০০০ ফুট পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে পাওয়া গেছে খনিজ তেলের সন্ধান।

মাটির নীচে 'পাতাল-ঘর' ব'লে কিছু ছিল নাকি?

প্রাচীন ভারতে মাটির নীচে রাজাদের প্রাসাদ তৈরী হতো—পুরাণে ও রামায়ণ মহাভারতে একথা পাওয়া যায়। ইতালী, রোম, মিশর, আলেক-

জান্ত্রিয়াতে প্রাচীন যুগের খ্রীষ্টানরা মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে তার দু'পাশে কফিনের মধ্যে মৃতদেহ পূরে রেখে আসতো—একে বলা হয় ক্যাটাকোম্ব (Catacomb) এইগুলোকেই বলা চলে সেকালের পাতাল-ঘর।

পাঁচ-মিশেলী প্রশ্ন

রবিবার ছুটি কেন ?

ওটা খ্রীষ্টানদের মতে Lord's day অর্থাৎ ঐদিন যীশু খ্রীষ্টের কাজে সবাইকে লাগতে হয়। ৩২১ খ্রীঃ অব্দে রোমসম্রাট কন্‌ষ্টেন্‌টাইন আইন ক'রে ঐ দিনে একমাত্র কৃষি কাজ ছাড়া সব কাজ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন। তার থেকেই রবিবার দিন ছুটির প্রচলন হয়েছে। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী প্রথম এদেশে রবিবার দিনকে ছুটির দিন ব'লে ঘোষণা করেন।

এক ঘণ্টা সময়কে ৬০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে কেন ?

এ ব্যবস্থাটা হয়েছে এইজন্যে যে, যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার তিন হাজার বছর আগে, ব্যাবিলনিয়া এবং আসিরিয়ায় যে সুমিরিয় জাতি বাস করত, তারাই প্রথম সময়ের মাপ আবিষ্কার করে ; এবং তখনকার দিনে এক থেকে ষাট পর্য্যন্তই ছিলো সংখ্যা গণনার মাপকাঠি। অর্থাৎ এখন যেমন আমরা এক থেকে একশো পর্য্যন্ত গুণে আবার একশো-এক, একশো-দুই - এম্‌নি ক'রে গণনা করি তারা সে হিসেব জান্‌ত না। কাজেই তারা সময়ের মাপ করবার সময়েও ঐভাবে ষাট ভাগে ভাগ ক'রেই এক ঘণ্টা তৈরী করেছিল। সেই থেকেই ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা ও ষাট সেকেণ্ড এক মিনিট, এই ভাবেই সময়ের হিসেব চলে আস্‌ছে।

ঘড়ি যখন চলে তখন টিক্ টিক্ ক'রে শব্দ হয় কেন ?

তার কারণ বুঝতে হ'লে বাবা, মা, বা দাদা, দিদিকে বলবে একটি ঘড়ির

পেছন দিককার ঢাকনা খুলে তোমাদের দেখাতে। দেখবে ঘড়ির ভেতরে অনেকগুলো চাকা আছে। সেকেণ্ডের কাঁটার পেছনে যে চাকাটা ঘুরছে, তার পাশে একটা চাকা একবার এদিক একবার ওদিক এই রকম ক'রে ঘুরছে, তাকে বলা হয় ব্যালান্স হুইল। বড় ঘড়িতে পেণ্ডুলাম যে কাজটি করে, ছোট ঘড়িতে এটি সেই 'ঘড়ি চলার গতি'তে সমান তাল বজায় রাখার কাজটি করে। আচ্ছা এর সঙ্গেই দেখবে লাগানো রয়েছে দু' দাঁতওয়ালা কাঁটা চামচের মত একটি ছোট অংশ—এই অংশটিকে বলা হয় 'প্যালেট ফর্ক ও আরবার' (Pallet Fork & Arbour)। এর শেষ প্রান্তের দুটো দাঁত পাশের ঘুরন্ত চাকাটিকে বা Escape wheel-কে একবার আটকাচ্ছে, আর একবার ছেড়ে দিচ্ছে। এই আটকানো আর ছাড়ার ব্যাপারটা ঘটছে এটা প্রতি সেকেণ্ডে একবার করে হচ্চে এবং প্রতিবারই ঠোকাঠুকির ফলে একটা টিক ক'রে আওয়াজ হচ্ছে, এখন অনবরতই ঘড়ি চলছে, কাজেই সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড ঘড়ি টিক্ টিক্ শব্দ করেই চলছে।

থার্ম্মোমিটার ভেঙে গেলে, পারাটা চারিধারে গড়িয়ে পড়ে, অথচ কাগজ দিয়ে বা হাতে ক'রে সহজে তোলা যায় না কেন?

এর কারণ হ'চ্ছে এই যে, পারার ছোট ছোট গোল টুক্‌রোগুলোকে নিরেট মনে হ'লেও আসলে পারা জিনিসটা জলের মতই তরল পদার্থ। কাজেই জল যেমন হাত দিয়ে টিপে ধরা যায় না, পারাও তেমনি ধরতে পারা যায় না। অন্যান্য তরল পদার্থের ধর্ম্মানুযায়ী সেও হাত ফস্‌কে পালায় বা জলের মতই গড়িয়ে পড়ে।

ঘি বা মাখন আগুনে জ্বাল দিলে গলে, অথচ ছানা ওরকম গলে না কেন?

এর কারণ কি জান? ঘি বা মাখনটিতে চর্ব্বির (Fat) অংশটিই বেশী থাকে, ছানাতে থাকে প্রোটীনের (Protein) অংশটিই বেশী। অর্থাৎ ঘি বা মাখনে কার্ব্বন, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের ভাগটাই এমন ভাগে

থাকে যাতে সেটা সহজেই গলতে বা পুড়তে পারে—কিন্তু ছানাতে থাকে নাইট্রোজেনের ভাগটাই বেশী, কাজেই সেটা ওভাবে গলানো সম্ভব হয় না।

ব্লটিং কাগজ কালি শুষে নেয় কেন ?

তার কারণ ব্লটিং পেপার এমনভাবে তৈরী করা হয়, যাতে কাগজটিতে তুলার আঁশের মতই জলশোষক আঁশ থাকে, অর্থাৎ এই আঁশের কোষে কোষে বায়ুভর্ত্তি খুব ছোট ছোট ছেঁদার ব্যবস্থাও থাকে—তাই কোন তরল পদার্থের সংস্পর্শে ঐ কাগজটি এলে তরল পদার্থটিকে সেই সব শোষক কোষগুলি টেনে নেয়। এই কারণেই ব্লটিং পেপারে কালি শুষে নেয়। লেখবার কাগজে কালি টানে না ঐ ভাবে, তার কারণ ঐ সমস্ত কাগজগুলির বায়ুভর্ত্তি কোষগুলিকে রোলারের চাপে চেপ্টে বায়ুশূন্য ও মসৃণ ক'রে দেওয়া হয়।

গরমে দুধ ট'কে যায় কেন ?

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত খাদ্যবিশেষজ্ঞ ডাক্তার রবার্ট হাচিন্‌সন বলেন যে, দুধে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড্ বর্ত্তমান থাকার জন্যেই দুধ ট'কে যায়। এই ল্যাক্‌টিক্ অ্যাসিড দুধে উৎপন্ন হয় নানা কারণে। প্রথমতঃ দুধে সব সময়ই 'ব্যাক্‌টেরিয়া ল্যাক্‌টিস' নামে জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা বাইরের আবহাওয়ার উত্তাপে আকারে ও সংখ্যায় বাড়ে এবং তার ফলেই বেশী গরম প'ড়লে দুধে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডের ভাগটা বেড়ে যায়, তাতেই দুধ ট'কে যায়।

টাকা পয়সা গিনি প্রভৃতি মুদ্রা খাঁটি রূপা, খাঁটি তামা বা খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী না করে অন্যান্য ধাতু মিশিয়ে তৈরী হয় কেন ?

এর কারণ টাকা পয়সা প্রভৃতি বহু হাত ঘোরে, কাজেই ওটা যাতে চট্‌পট ক্ষয়ে না যায় সেদিকে দেখতে হবে তো! তাই বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করতে লাগলেন। দেখা গেল খাঁটি তামা, খাঁটি রূপা এবং খাঁটি সোনার সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মেশালে যে মিশ্র ধাতু তৈরী হয়, সেগুলো খাঁটি ধাতুটির মত অত

তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয় না। কাজেই, সেই ব্যবস্থা মত আধুনিক কালে সব মুদ্রাকেই একাধিক ধাতু মিশিয়ে শক্ত ও ক্ষয়-নিবারক ক'রে তোলা হয়।

হ্যারিকেনের পল্‌তে বা প্রদীপের সল্‌তের গোড়াটাই থাকে তেলে ডুবে, কিন্তু পল্‌তের গলায় তেল এসে পৌঁছায় কি ক'রে?

সোজা কথায় হয়তো এর জবাব দেওয়া যায় তেল শুষে নেয় ব'লে। কিন্তু কি ক'রে এই শোষণ করা সম্ভব হয়, সেটাও তো জানা চাই? এক কাজ করো, দু'টো দু'মুখ খোলা কাচের ফাঁপা নল নাও—দুটোই লম্বায় এক মাপের হওয়া চাই, কিন্তু একটা হবে খুব সরু, আর একটা তার চেয়ে বেশ একটু মোটা। আচ্ছা, এইবার একটা পাত্রে জল রেখে জলের ভেতর দুটো নলকে এমন ভাবে খাড়া ক'রে চেপে ধরো যে, নলের একটা খোলা মুখ গিয়ে ঠেকে পাত্রের তলায়। এখন দেখো মোটা নলটায় যত উঁচু অবধি জল উঠেছে, তার চেয়ে বেশী উঁচু হয়ে জলটা উঠেছে সরু নলটায়। তাহ'লে বুঝলে যে, ফাঁপা নল যত সরু হয় তত বেশী উঁচুতে জলকে টেনে তুলতে পারে। এইবার জেনে রাখ—যে সমস্ত জিনিস 'শোষক', সেগুলোতে ঐ রকম বহু সূক্ষ্ম নল লুকোনো থাকে—একে বলে 'কৈশিকী' নল। আমরা শুধুচোখে ঐগুলো দেখতে পাই না এবং সেই সব নলের মারফৎ এই যে শোষণ ক্ষমতা, একেই বৈজ্ঞানিকরা ইংরেজীতে বলেন Capillary attraction। পল্‌তে বা সল্‌তের এই ক্ষমতা আছে, তার কারণ পলতের সূতোর কোষে কোষে রয়েছে চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম সব কৈশিকী নল।

রেডিওর এরিয়াল (Aerial) কি ক'রে শব্দ ধ'রে আনে রেডিও যন্ত্রে?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, রেডিওর Aerialএ শব্দটা শব্দ হয়েই আসলে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে রেডিও ষ্টেশন থেকে মানুষের গলার স্বর বা শব্দকে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত ক'রে বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, সেই বিদ্যুৎ-

তরঙ্গগুলি। এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গগুলি একের পর একটি এসে Aerialএর তার ধাক্কা দেয়, ফলে এই তার সৃষ্টি করে এক রকম ইলেকট্রিক কারেণ্ট, বা শব্দের ঢেউয়ের মতই অনবরত কাঁপতে থাকে। এই কারেণ্ট ঐ তার ধরে নেমে যায় রেডিও যন্ত্রের Tuning Condenser ব'লে অংশটিতে। তখন এই শব্দের বৈদ্যুতিক ঢেউগুলিকে আরও বাড়িয়ে নেয় রেডিও যন্ত্রের Radio Frequency Amplifier ব'লে আর একটা অংশ, কিন্তু তাতেও শব্দের কাঁপন এত তাড়াতাড়ি হ'তে থাকে যে, তখন যদি সেই বিদ্যুৎ তরঙ্গকে আবার শব্দতরঙ্গ ক'রে নেওয়া যায়, তাতে মানুষের কানে শুনে বোঝবার পক্ষে অত্যন্ত দ্রুত হয়ে পড়বে। তাই সেখান থেকে পাঠানো হয় ডিটেক্টর (Detector) ব'লে অংশটিতে, সেখানে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গের কাঁপনের বেগ কমিয়ে নিয়ে শোনবার উপযুক্ত ক'রে নেওয়া হয়। তখন এই ঢেউ-গুলিকে শব্দে রূপান্তরিত করা হয় Audio Frequency Amplifier অংশটির সাহায্যে। সেখান থেকে আবার শব্দটাকে কমবেশী করবার ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া হয় রেডিওর ভিতরের Loud Speaker-এ নিয়ে গিয়ে। এই হ'ল মোটামুটি ব্যাপারটা।

গঙ্গার জলে বয়াগুলো (Buoy) ভাসে অথচ এদিক ওদিক সরে যায় না কেন?

কারণ প্রত্যেকটি বয়ার তলায় মজবুত লোহার শেকলে এক একটি চওড়া লোহার ভার আটকানো আছে, সেগুলো নদীর তলার মাটিতে এঁটে বসে থাকে। এই লোহার ভারগুলোকে বলা হয় Sinker, গভীরতা ও বয়ার ওজন অনুসারে এক একটি Sinker-এর ওজন ১০ হন্দর থেকে ৩০ হন্দর পর্য্যন্ত হয়।

কেঁচো মানুষের কি উপকার করে?

কেঁচো মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে খুঁড়ে মাটিকে জল গ্রহণের উপযুক্ত ক'রে তুলে তার উর্ব্বরতা শক্তি বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত গিলবার্ট

হোয়াইট বলেছেন যে, মাটিতে যদি কেঁচো না থাকতো তাহ'লে অচিরেই উর্ব্বরতাশক্তি লোপ পেত, মাটি শক্ত পাথর হয়ে যেতো। অর্থাৎ গাছ ফসল, মাটিতে কিছু ফলতো না তাহ'লে। এছাড়া কেঁচোর দেহের রস থেকে ঔষধ তৈরী হয়। কাজেই কেঁচো মানুষের বহু উপকার যে করে তাতে আর সন্দেহ কি?

হাড়গুলোর রং সাদাই হয়?

না। তাজা হাড়গুলো হয় লালচে রঙের। পুরানো বা শুকনো হাড়গুলোই সাধারণতঃ সাদাটে বা ধূসর রঙের হয়।

আমাদের শরীরে কতগুলো হাড় আছে?

সাধারণতঃ একজন বুড়ো মানুষের কঙ্কাল গুণে পাওয়া যায় ২০৬টা আলাদা আলাদা হাড়, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ হাড় যেগুলি ছোট বয়সে আলাদা আলাদা থাকে, বুড়ো বয়সে তা জোড়া লেগে যায় এক হয়ে। যেমন ধরো তোমাদের পিঠে শিরদাঁড়াতে আছে মোট ৩৩ টুকরো হাড়, বয়স বাড়ার সঙ্গে ওপরের ২৪ টুকরো ঠিকই থাকে—২৫, ২৬, ২৭, ২৮ আর ২৯ সংখ্যক হাড় পাঁচটা পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে হয়ে যায় একটা বড় টুকরো।

এক এক মিনিটে আমরা কয়বার নিঃশ্বাস নিই?

বয়সের তারতম্যের সঙ্গে নিঃশ্বাসের সংখ্যারও কম বেশী হয়। যেমন ধরো, সদ্যোজাত শিশু এক মিনিটে নিঃশ্বাস নেয় ৬২ থেকে ৬৮ বার, এক বছর বয়সের খোকা এক মিনিটে ৪৪ বার নিঃশ্বাস নেয়, ৯ বছরের ছেলে ২৬ বার, ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সের লোক ১৮ থেকে ১৯ বার, ২৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের লোক মিনিটে ১৬ বার নিঃশ্বাস নেয়, কিন্তু ৩০ থেকে ৫০ বছরের লোকেরা নেয় ১৮ থেকে ১৯ বার। এছাড়া নিঃশ্বাস নেওয়াটা অনেক সময় আমাদের কাজকর্ম্মের ওপর নির্ভর করে এবং সেই অনুপাতে কমে বাড়ে। যেমন ধরো একজন বয়স্ক লোক যখন শুয়ে থাকে, তখন সে নিঃশ্বাস নেয় মিনিটে মাত্র ১৩ বার, কিন্তু ঐ লোকটাই আবার যখন দৌড়-ঝাঁপ করে তখন নিঃশ্বাস নেয় মিনিটে ৬০ বার।

'লঙ্কা' ঝাল হয় কেন ?

লঙ্কার ভেতরে যেখানে লঙ্কার বীচিগুলো আটকানো থাকে—সেখানে 'গ্লুকোসাইড' (Glucoside) ব'লে এক রকম পদার্থ জমানো থাকে—ঐ 'গ্লুকোসাইড, জিনিসটাতে ঝাঁঝালো ও ঝাল স্বাদের এক রকম উড়ুক্কু তেল (Volatile oil) থাকে, তার থেকেই লঙ্কার ঐ ঝাল-স্বাদের জন্ম। এই 'গ্লুকোসাইড' জিনিসটি মরিচ, পিপুল ও আরও বহু ফল ও বীজে থাকে এবং সেগুলির স্বাদও সেইজন্য ঝাল হয়।

সোনার চেয়ে দামী ধাতু কী কী ?

সোনা সব চেয়ে দামী ধাতু নয়। সোনার চেয়ে বেশী দামী ধাতু বলতে বোঝায়—১। বেরিল্লিয়াম (Beryllium) ২। প্লাটিনাম (Platinum) ৩। রেডিয়াম (Radium) ৪। প্যাল্লাডিয়াম (Palladium) ৫। অস্‌মিয়াম্ (Osmium) ৬। ইরিডিয়াম (Iridium) ৭। ভ্যানাডিয়াম (Vanadium)।

দুধে লেবুর রস দিলে ছানা কেটে যায়, আর দম্বল দিলে দই হয়ে যায় কেন ?

এর কারণ হচ্ছে, ছানা কাটার ব্যাপারটা আসলে ঘটে লেবুর রসে যে এ্যাসিড্ থাকে তারই রাসায়নিক ক্রিয়ায় দুধের 'কেসিন' Casein অংশ আলাদা হয়ে যায়। আর দম্বল দিলে দই হয়ে যায় সেটা হচ্ছে জীবাণুদের কাণ্ড—দইয়ের দম্বলে যে 'ল্যাক্‌টাস্' জীবাণু থাকে তাত আগেই পড়েছ।

মাকড়সার জাল কি ক'রে তৈরী হয় ?

মাকড়সার শরীরের পিছন দিকে একটি অংশ আছে, যেখানে এক রকম চট্‌চটে আঠার মত জিনিস আপনা থেকেই তৈরী হয় এবং সেই রস বার হওয়ার জন্যে সেখানে 'স্পিনারেটস্' (Spinnerets) ব'লে কতকগুলি নালী আছে। মাকড়সার শরীরের ঐ অংশে রস তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসে যখন তখনই বাইরের হাওয়ায় শুকিয়ে গিয়ে সব সরু রেশমের স্থতার আকার নেয়।

মাকড়সারা ঐ সুতার মত জিনিসটাকে তাদের পায়ের সাহায্যে বিছিয়ে দিয়ে জাল বোনে।

'পাঁউরুটি' কি ক'রে অত ফোলে ?

এর কারণ, পাঁউরুটির ময়দাতে 'ঈষ্ট' (Yeast) ব'লে একরকম পদার্থ দেওয়া হয়। এই 'ঈষ্ট' পদার্থটিতে 'মদ্যাণু' থাকে এবং তার ফলে রুটির ময়দাতে যে কার্বোহাইড্রেট থাকে—তাতেই এর প্রতিক্রিয়ায় 'পচন' ক্রিয়া সুরু হয়। কাজেই 'ঈষ্ট' মাখানো ময়দার তাল আগুনের উত্তাপে রাখলে ময়দার ভেতরের 'কার্ব্বন ডায়ক্সাইড' গ্যাসটা বিস্তার লাভ করে, ফলে পাঁউরুটি অত বেশী ফুলে ওঠে।

কাঠ জলে বা খোলা জায়গায় রাখলে পচে যায় কেন ?

তার কারণ, কাঠটা আসলে মরা গাছ। মাছ, মানুষ, জীবজন্তু যতক্ষণ বেঁচে থাকে, ততক্ষণ তার 'জীবনীশক্তি' তাকে নানারকক জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তারা 'জীবনীশক্তি' হারায়—তখনই জয়ী হয় জীবাণুরা। ঠিক এই ব্যাপারটা ঘটে 'মরা গাছ' বা কাঠে। নানারকম 'ব্যাক্টেরিয়া' বা জীবাণু তখন কাঠকে আক্রমণ করে বা কাঠের গায়ে 'ফান্‌জি' বা শ্যাওলা জাতের সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ কাঠের ভেতর বেড়ে উঠে কাঠকে অন্তঃসার-শূন্য ক'রে ফেলে—খোলা হাওয়ায় ও জলের মধ্যে এই ব্যাপারটা ঘটে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি, তাই কাঠ এইভাবে পচে বা ক্ষয় হয়।

'মুক্তা' কি ক'রে ঝিনুকের ভেতরে জন্মায় ?

'ঝিনুক' বা 'শুক্তি' জাতীয় জীবের শক্ত খোলার ভেতরটা একরকম হড়হড়ে সাদা রসে সব সময় ভিজে থাকে,—এই সাদা রসের আবরণটা ঝিনুকের ভেতরের নরম দেহটিকে ঐ শক্ত খোলার সঙ্গে ঘসাঘসির আঘাত

থেকে রক্ষা করে। এই আবরণটাকে বলে ন্যাক্রে (Nacre) বা 'মাদার অব পার্ল'। এই সাদা রসটাই শুকিয়ে ঝিনুকের খোলার ভেতরটিতে অমন সুন্দর চক্‌চকে রূপালী একটি মসৃণ আবরণের সৃষ্টি করে যে তা তোমরাও দেখেছ—এখন 'মুক্তার' জন্মটাও ঐ রস থেকে হয়। কি ক'রে? যে সব ঝিনুকের দেহের ভেতরে খুব ছোট বালুকণা ঢুকে যায়, সে সব ঝিনুকের ভেতরে তখন ঐ ছোট বালুকণা একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে; কিন্তু ঐ হড়্‌হড়ে রসটা বা 'ন্যাক্রে'টা যখন ঐ বালুকণার চারধারে লেগে বালুকণাটিকে ঢেকে দেয়—তখন আর ঝিনুকের ভেতরটাতে অস্বস্তি থাকে না, এই ভাবে ক্রমশঃ ঐ রস জমে জমেই বালুকণাটিকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে এবং সেটা তখন ঝিনুকের খোলার ভেতরে লেগে যায়। ঐটাকেই বলি আমরা 'মুক্তা'।

খবরের কাগজের খবরের নীচে এ-পি (A. P.) ও ইউ-পি (U. P.) বা P. T. I. R. লেখা থাকে কেন?

খবরে কাগজের খবরের নীচে 'এ-পি' বা 'ইউ-পি' লেখা থাকে এইজন্য যে—ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় খবর ছড়িয়ে দেবার জন্য এদেশে 'এসোসিয়েটেড প্রেস' (Associated Press) ও 'ইউনাইটেড প্রেস' (United Press) নামে যে দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে, ও কথা দুটি তাদেরই ইংরাজী নামের সংক্ষিপ্ত চেহারা। 'এ-পি' দেখলেই বুঝবে খবরটি কাগজওয়ালারা পেয়েছে 'এসোসিয়েটেড্ প্রেসের'কাছ থেকে, আর 'ইউ-পি' দেখলে বুঝবে ইউনাইটেড প্রেস' বলে প্রতিষ্ঠানের দেওয়া খবর। 'রয়টার' লেখা থাকলে বুঝতে হবে—সেটা 'রয়টার' নামে যে খবর দেওয়ার প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গা থেকে খবর পাঠাচ্ছে, খবরটি তাদেরই পাঠানো। সম্প্রতি ভারতের রয়টার প্রতিষ্ঠানটি Press Trust of India নামে একটি প্রতিষ্ঠানভুক্ত হয়েছে তাই আজকাল খবরের কাগজের খবরের তলায় লেখা হচ্ছে P. T. I. R.

সব রকম রঙ একসঙ্গে মেশালে কী রকম রং হবে?

স্পেকট্রাম' (Spectrum) বা 'বর্ণালী'র সব রঙগুলো একসঙ্গে মেশালে রঙের অস্তিত্বই থাকে না আর। কিন্তু রঙের বাক্সের সব রঙগুলো মেশালে হবে কালচে ধরণের বাদামী রঙ।

বাজ পড়ার শব্দ কতদূর পর্য্যন্ত শোনা যায়?

আবহাওয়া বিশারদরা বলেন যে—বাজ পড়ার শব্দ ২০ মাইল পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে—তবে সাধারণতঃ ১০ থেকে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত বাজ পড়ার শব্দ শোনা যায় অনায়াসে।

ঘড়ির সময় ঠিক করতে কাঁটা কি সব সময়ই সোজা দিকে ঘোরাতে হয়?

উল্টো দিকে ঘোরালে ঘড়ি খারাপ হ'য়ে যায় ব'লে তোমাদের সকলের যে ধারণা আছে সেটা ঠিক নয়। ঘড়ির সময় ঠিক করার সময় সব সময়ে মনে রাখবে যেদিক থেকে সঠিক সময়টি কাছে হবে—সেই দিকেই কাঁটা ঘোরানো উচিত! তবে বাজা-ঘড়িতে অর্থাৎ যে সব ঘড়ি বাজে—সেগুলির বাজনার মিল রাখার জন্যে সোজা দিকে ঘোরানোই স্থবিধা।

মানুষের মাথায় কত চুল আছে?

এ প্রশ্নটা শুনলেই তোমরা হয়ত বলবে—'তা কি বলা যায়?' সত্যি কথা, সঠিক গুণে বলা শক্ত যে মানুষের মাথায় কতগুলি চুল আছে। কারণ মাথা তো সবারই সমান নয়, কারু বড়, কারু ছোট,—তবে বৈজ্ঞানিকরা বলেন—সাধারণতঃ মানুষের মাথায় গড়পড়তা ১ লক্ষ চুল থাকে। এই যে হিসাবটা তাঁরা পেয়েছেন—তা চুলগুলিকে একটি একটি ক'রে গুণে নয়। কি করে জান? তাঁরা চুলের ব্যাস মেপে দেখেছেন যে—এক একটি চুলের

ব্যাস হচ্ছে ১ ইঞ্চির ৪০০ ভাগের এক ভাগ—অর্থাৎ চারশো চুল গোছা করলে এক ইঞ্চি ব্যাস পাওয়া যাবে। এখন মাথার চুলওয়ালা অংশের মাপ কতো ইঞ্চি বার করলেই সহজেই বলা যেতে পারে গড়পড়তা সেখানে কত চুল আছে।

জলের ভেতরে মানুষ কতক্ষণ ডুবে থাকতে পারে ?

জলের ভেতরে সবচেয়ে বেশীক্ষণ ডুবে থাকার হিসাব যা পাওয়া যায়—তা হচ্ছে ১৮৮৬ সালে ৭ই এপ্রিল—লণ্ডনের এক থিয়েটারে এক ট্যাঙ্কের জলে 'জে, ফিন্নী (J. Finney) বলে একটি লোক ৪ মিনিট সওয়া ২৯ সেকেণ্ড ডুবে ছিল। এর চেয়ে বেশীক্ষণ আর কেউ ডুবে থাকতে পারেনি এ পর্য্যন্ত।

বর্ণানুক্রমিক প্রশ্ন-সূচী

খ

গ

স

হ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড

সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকার কয়েকটি মতামত ঃ

"দেশ" পত্রিকা বলেন ঃ—

"জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" (১ম ভাগ) - 'মৌমাছি প্রণীত

বাঙলা দেশে শিশু-সাহিত্যের যে সকল পুস্তক অধুনা আমাদের চোখে পড়ে তাহার অধিকাংশই রূপ-কথা আর রোমাঞ্চকর গল্পে ভরা। শিশুদের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি অনুসন্ধিৎসু মনকে জাগাইয়া রাখিবার প্রতি বর্ত্তমানে যে সকল চেষ্টা দেখা যায় তাহা যেমন অকিঞ্চিৎকর তেমনই অক্ষম। সেদিক দিয়া আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দ-মেলা বিভাগের মৌমাছির এই প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশুদের জ্ঞান-সন্ধিৎসু চিত্তে নানা বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন জাগে, লেখক সরল সহজ ভাষায় তাহার উত্তর লিখিয়াছেন, এমন কি বিজ্ঞানের অনেক জটিল প্রশ্নকেও তিনি ছোটদের উপযোগী করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক 'জ্ঞান বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড'কে তিন ভাগে প্রকাশিত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। প্রথম ভাগের প্রশ্ন ও উত্তর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী করিয়া লিখিত। এই ভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা আছে—(১) বাঙলা ও বাঙালী ; (২) তুমি ও তোমার শরীর ; (৩) জল, হাওয়া, আলো, উত্তাপ ; (৪) গাছপালার জগৎ ; (৫) জীব-জগৎ ; (৬) আকাশের রাজত্বের খবর ; (৭) পাঁচমিশেলী প্রশ্ন। বইখানি বাঙলা দেশের শিশু-সাহিত্যের একটি মস্ত অভাব দূর করিবে এবং এই ধরণের বইয়ের প্রচার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে হাওয়া বাঞ্ছনীয়। বইখানির প্রচ্ছদপট দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

"যুগান্তর পত্রিকা বলেন ঃ—

"জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" (১ম ভাগ)—'মৌমাছি' প্রণীত

অনুসন্ধান করিবার ক্ষুধা মানুষের স্বাভাবিক প্রবল বৃত্তি। শিশুদের মধ্যে এই বৃত্তির নিরাবরণ চেহারা অতি প্রকট। ছোটকাল হইতে ছেলেমেয়েরা যা কিছু দেখে ও শোনে, তাহার কারণ ও পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। 'মৌমাছি' নামক জীবটি নিতান্তই মধুলোভী, সুতরাং তিনি নানা স্থান হইতে নানা প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ করিয়া তাঁহার চাক বাঁধিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার মধুভাণ্ড হইতে মধু সংগ্রহ করিতে গিয়া ছেলেমেয়েদের গায়ে হুলের খোঁচা বিঁধিবে না। তাহারা অনায়াস আনন্দেই জ্ঞান-মধু লুণ্ঠন করিবে।

Amrita Bazar Patrika বলেন ঃ

"This is Indeed a remarkable book for children from the pen of "Maumachi" who conducts with conspicuous ability the weekly children's page of a wellknown Bengali daily of Calcutta. It conveys knowledge on a wide variety of topics relating to arts and science for students of our schools in the shape of a good number of questions and answers.

"The book is a mine of information, a treasure-trove of knowledge for our young hopefuls who should be induced to purchase it and dive deep into its treasures. It will be what children's curiosity to know more about men and things. The educative value of such a work can hardly be exaggerated. The printing and get-up are tastefully done."

'Hindusthan Standard' পত্রিকা বলেন ঃ

"Thousands of children are acquainted with the felicituous writings of "Maumachi" who edits the Children's Page of "Ananda Bazar Patrika" This is his pen-name.

"We had occasion previously to review some of his books, and this time he comes out with a miniature Cyclopædia of Knowledge which will help our children in augmenting their general knowledge. He has specially designed the book for schools, the first part being meant for fifth and sixth forms, the second for seventh and eighth and the third for two topmost classes. It is expected that the series will get the approval of the Text-Book Committee. As a text-book the book will help in giving general knowledge to students from early years. We know that some of the products of our University are ludicrously deficient in general knowledge ; that is certainly because of the faulty system of education. Books like these alone can remove that defect. But one point must be stressed that is, the book is not drab like text-books in general ; there is something in it which feeds our curiosity. The detailed index at the end is a good guide."